উল্টো কথা

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

উল্টো কথা

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

প্রকাশক

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

মূল্য—আট আনা

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,

মেট্‌কাফ্‌ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌;

৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ

শ্রীচরণেষু—

সোজা কথা বলিলে সবাই উল্টো বোঝে, তাই, উল্টো কথা বলিলাম যদি কেহ সোজা বোঝে। ভগবান উল্টো-সোজা দুয়েরই শ্রোতা এবং বিধাতা—তাই এ পাগলের প্রলাপ আপনাকে শুনাইবার দুঃসাহস হইল। ইতি—

সেবক হেমন্ত।

মুখবন্ধ

উল্টো কথা—সাহিত্য, শিল্প, সমালোচনা, ভাষা, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ। নারায়ণ, যমুনা, উপাসনা, মোসলেম ভারত প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় গত ২।১ বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতি—

আশ্বিন, ১৩২৮
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।

সূচীপত্র

ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

আমাদের পুস্তকাবলী :—

১। **স্বদেশরেণু**—(চতুর্থ সংস্করণ)—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।•

এই পুস্তকখানিতে শিশুদিগের উপযোগী কতকগুলি স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক ছড়া আছে। "জুজু-বুড়ী" ও "ছেলে-ধরা" প্রভৃতি যে সব শিশুপাঠ্য ছড়ার আজকাল বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই কবিতাগুলি যে ছোট ছেলে-মেয়েদের অধিকতর কল্যাণ সাধন করিবে ও তাহাদিগকে বিমল আনন্দ দান করিবে, ইহা নিশ্চিত। বঙ্গদেশে প্রত্যেক মায়ের কাছে এই পুস্তক এক একখানি থাকা উচিত।

২। **পল্লীব্যথা**—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

এই কবিতাগুলিতে পল্লীজীবনের দুঃখময় করুণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বাংলার অন্তরতম প্রদেশের দুঃখ দৈন্য বেদনাকে এমন ভাবে আর কেহ চোখের জলে ফুটাইতে পারেন নাই।"

৩। **ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন**—(সচিত্র) মূল্য ৸৹ আনা।

সুকুমাররঞ্জন দাশ প্রণীত। চিত্তরঞ্জনের যে কয়খানি জীবনী এ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে এই খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহাই একমাত্র সম্পূর্ণ ও বিশ্বস্ত জীবনী।

৪। **শ্রীঅরবিন্দ** (সচিত্র)

অরবিন্দ ঘোষের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত

অতি অল্প লোকেই জানেন। তাই এই সংক্ষিপ্ত জীবনী খানি সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

৫। বিশ্বভারত—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

"বিশ্বসভ্যতায় ভারতের বাণী"—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

৬। স্বরাজ ও খলিফত (সচিত্র)—বীরেন্দ্রনাথ সেন ।৵৹

"স্বরাজ" "খলিফত" প্রভৃতি বলিলে কি বুঝায়, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা বাংলাদেশের অনেকেরই নাই। লেখক এই বর্ত্তমান সমস্যাগুলি সাধারণকে বুঝাইতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

৭। ছায়াবাজি—হেমন্তকুমার সরকার ॥৹

(নতুন ধরণের গল্পের বই।)

৮। পষ্ট কথা—হেমন্তকুমার সরকার ।৶৹

(ভাষা, শিক্ষা সাহিত্য, শিল্প, সমালোচনা-বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ।)

৯। যুগ-শঙ্খ—হেমন্তকুমার সরকার ৷৹

(যুগোপযোগী প্রবন্ধ।)

১০। **Non-co-operation**—B. C. Pal As. 8

১১। A **Message of Hope**—P. K. Sarker • 5 •

—Being an explanation of Prabhu Jagatbondhu's mission.

১২। লেনিন ।৹

১৩। নানা চিন্তা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৲

১৪। প্রবন্ধমালা ঐ ১॥৹

১৫। কাব্যমালা ঐ ১॥৹

উল্টো কথা
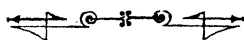
বর্ত্তমান বাঙ্লা সাহিত্য

শুনিয়াছি বড় মামা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া মেডেল পাইলে চারি পাশের গাঁয়ের লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। বাংলায় এমন একটা দিন যে ছিল আজকালকার আপিসে আপিসে তাড়া-খাওয়া গ্রাজুয়েটের দল বোধ হয় স্বপ্নেও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম গ্র্যাজুয়েট হইয়া বাংলার ভবিষ্যৎ দুঃখের পথ উন্মুক্ত করেন—তখন নাকি ফোর্ট উইলিয়ম হইতে তোপ পড়িয়াছিল। আজ বাংলা দেশে গ্র্যাজুয়েট দলে দলে বাহির হইতেছে—অথচ একটাও তোপ পড়িল না দেখিয়া ভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে বকেয়া তোপগুলি একসঙ্গে দাগিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পাশ হইলে গাঁয়ের লোক জড় হওয়া বা গ্র্যাজুয়েট হইলে তোপ পড়ার যুগ আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখনও যায় নাই। নিরস্ত পাদপের দেশে এরণ্ডও দ্রুম বলিয়া গণ্য হয়, আমাদের

সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের দেশে সাহিত্য-সম্রাট, সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীর ছড়াছড়ি—সবাই যদি সম্রাট হয়, তবে পদাতিক বা কে, আর প্রজাই বা কে? বাংলাদেশের রাজ্যবিহীন রাজা মহারাজার ন্যায় এই সকল সম্রাটকে সকল সময়েই ঋণের পিরামিডের মাথায় বসিয়া উঁচু হইতে হয়। সুখের বিষয় দেশের লোক জানে না—তাঁহারা কোথা হইতে ঋণ সংগ্রহ করেন, অবশ্য তাঁহারাও বুদ্ধিমানের মত স্বীকার করেন না—কোন্ ধনাগার হইতে এই সম্পদ ধার করিয়া লইয়া থাকেন।

বাংলা সাহিত্য-সেবার প্রাইজ পশ্চিমের সরস্বতী টাকা হিসাবে বেশ মোটা কিছুই দিয়াছেন—দরিদ্রের জাতি, অত গুলি টাকা এক জায়গায় দেখিয়া আনন্দে আমাদের পেট ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এক দেশে মাত্র একজন ব্যারিষ্টার ছিল—পাড়াগাঁ হইতে লোক আসিয়া তাঁহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত;—কলিকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে আসিলে এই প্রশংসমান পল্লীবাসীদের বিস্ময়-সূচক হাঁ-টা বোধ হয় এত বিস্তৃত হইত যে তাহাতে বঙ্গ ভঙ্গের মত মুখে একটা compound fracture হইয়া তাহাদের বাঁচিবার কোনো সম্ভাবনাই থাকিত না।

"তনয় যগুপি হয় অসিত বরণ
প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন।"

আমাদের দেশের সাহিত্য বলিয়া তাহাকে আদর করি, প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহার সেবা করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের আসল ব্যাপারটা কি তাহাও হুঁস থাকা দরকার। সে খেয়াল না থাকিলে ক্রমজীবনে এরণ্ড হইয়াই কাটাইতে হইবে। আমরা চোখ বুঁজিয়া এই

ভাবিয়া বসিয়া আছি যে, ভারতের মধ্যে আমরাই অগ্রসর জাতি—ভারতের শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, সাহিত্য-গুরু আমরা। কিন্তু প্রদীপের নীচে কতটা অন্ধকার সেদিকে দৃষ্টি নাই। আমাদের দীপটি হইতে জ্বালাইয়া লইয়া মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী, হিন্দুস্থানী জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যক্ষেত্রে দীপালি উৎসবের আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে—আমরা আমাদের অচলায়তনের কোণে শিবরাত্রির সলিতাটি লইয়াই বসিয়া আছি।

বিশ্বসাহিত্যে আমরা কি দিয়াছি? রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়িয়া দিলে, আর কোন্ সাহিত্যরথী, বিশ্বের দরবারে স্থান পাইয়াছেন? আমাদের সাহিত্য-সম্রাটগণ সবই 'স্বদেশে পূজ্যতে';—'সর্ব্বত্র পূজ্যতে' এমন সাহিত্যিক চাই, যিনি বিশ্বমানবের মর্ম্মের অন্তস্তম স্থলটিতে আঘাত করিয়া বাঙালীর নিজস্ব সুরটিকে জগতের করিয়া দিবেন। বাংলার সে সেক্‌স্‌পীয়র, গেটে, টল্‌ষ্টয় এখনো তো আসিল না!

আমাদের নিজের প্রাণের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ নাই। তাই ঠিক সুরটি ধ্বনিত হইতেছে না। কি একটা বেসুরো অবাস্তবতায় আমাদের সাহিত্য মূক হইয়া রহিয়াছে। কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম বাংলার মুদীর দোকান হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। মুসলমানও রামায়ণের রচনায় কত আগ্রহ দেখাইয়াছিল। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের একতার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র যে সাহিত্যে, সে ভাব চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলী রামপ্রসাদের গান আজও বাংলার খোলা মাঠ প্লাবিয়া রাখালের গলায় ধ্বনিত হয়, আবার কর্ম্মরত গৃহস্থের ব্যস্ত-জীবনের মাঝে বৈরাগীর খোল করতাল, বাউল ফকিরের একতারার সঙ্গে আসিয়া খানিকক্ষণের জন্য জীবনের দুর

লক্ষ্যের আবছায়া চিত্রটা মনের মধ্যে জাগাইয়া দিয়া যায়। কিন্তু আজ লোকের মধ্যে আমাদের সে সাহিত্য কই ?

ইংরেজী ভাবে তৈরী, ইংরেজী সভ্যতার by-productদের জন্য একটা সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু সেটা ধনীর গৃহে শূন্যে ঝোলানো সুন্দর আগাছার মতই শোভা পাইতেছে। দেশের মাটীতে তাহার শিকড় নাই—তাহার মাথাটা নীচের দিকে আর গোড়াটা উপরে। মালীর জলদানে তাহার পুষ্টি ; ভানুর পবিত্র কিরণ ঝিলিমিলির ভিতর দিয়া তাহার গায়ে কালেভদ্রে লাগে—বাহিরের উন্মুক্ত হাওয়া পর্দার ফাঁক দিয়া আসিয়া তাহাকে কখনো কখনো দোলায়—আকাশের বৃষ্টি হয় তো কোনো দিন অসাবধানতায় খোলা জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার গায়ে ছাট দেয়—নিশার শিশির তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই নিরস্ত হয়, প্রকৃতি সে মণির মত উজ্জ্বল ঢলঢল অলঙ্কার তাহার মাথায় পরায় না--আমাদের সাহিত্যের আজ এই অবস্থা !

সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা চাই।

ধর্ম্মের ন্যায়, স্মৃতির ন্যায়, বিদ্যার ন্যায় সাহিত্যেরও একটা শিক্ষা দিবার কাজ আছে। The object of writing a story is story-writing—গল্পলেখার সার্থকতা গল্পলেখাতেই, এ সব কথা paradoxএর জন্য শুনিতে ভাল এবং বলাও বোধ হয় সেই কারণেই হয়। কিন্তু চরমে সাহিত্যের একটা উদ্দেশ্য তো আছে। সাহিত্যিকের নিকট সাহিত্য সৃষ্টি শুধু ঘুম পাওয়ার মত, ক্ষিদে পাওয়ার মত—একটা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাহার ভিতর আর্ট আছে, চেষ্টা আছে, ভাব আছে। থিয়েটারের ষ্টেজে দাঁড়াইয়া অভিনেতা যেমন দর্শকগুলিকে

সামনে রাখিয়া অভিনয় করেন, সাহিত্যিকও পাঠকবর্গের হাততালির দিকে কাণ খাড়া রাখিয়া লিখিয়া থাকেন। সোণালি ঊষার গলা ফুলাইয়া স্ফুর্ত্তির জ্বালায় পাগল দোয়েলের মত আপন মনে গান করিবারই যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে শাহারার মরুস্থানে কিম্বা আমেরিকার জঙ্গলে সাহিত্যিকদিগের জন্য একটা (penal settlement) বন্দী উপনিবেশ করিলেই ভাল হয়। লিখিয়া ছাপানই বা কেন? আর বিজ্ঞাপন দেওয়াই বা কেন? তাই সাহিত্য শুধু subjective বা অন্তরের নয়, সে একটা বহির্জগৎ বা object এর নিকট তাহার সার্থকতা পাইতে চায়। কবি নিজে কবিতা লিখিলেই তৃপ্ত হন না—জগৎকে শুনাইয়া তৃপ্ত হইতে চান। জগৎকে যখন শুনাইতে চান—তখন জগৎ কি চায়, সেটাও একটু মনের মধ্যে আসিয়া পড়িবে বই কি।

অবশ্য প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য দেশকাল পাত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক বিশ্বমানবের চিরন্তন প্রশ্নগুলিকে অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবে। তাহার সৃষ্ট চরিত্র হয় তো স্মৃতিশাস্ত্র বা সমাজের আইন মাফিক না হইতে পারে। না হওয়াই স্বাভাবিক, মানুষের জন্মটাও তাহাকে পরামর্শ করিয়া হয় নাই, তাহার জীবনটাও লজিকের যুক্তি অনুসারে চলে না। সে মানুষ—একটা আস্ত জ্যান্ত জানোয়ার এবং লজিকের syllogism নয় বলিয়াই—তাহার জীবনটা এই একটা পাগলের খেয়ালের মত, রহস্যের মত হইয়া চলিয়াছে। এই রহস্যের অন্তরালে উঁকি মারিতে গিয়া বিফল চেষ্টায় যে সৌন্দর্য্যরসের অবতারণা—তাহাই তো প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

আমাদের সাহিত্যে এই সকলের কথা খুব কমই আছে। নাটক, নভেল এবং কবিতার ভরে বাংলা সাহিত্য যায় যায় হইয়াছে। নাটকের

চরিত্রগুলি যেমন অস্বাভাবিক, অভিনয়ও তদ্রূপ। যে নায়কের চরিত্র ভাল সে একবারে সুশীল ও সুবোধ বালকের মত—ভাজা মাছখানি পর্য্যন্ত উল্টাইয়া খাইতে জানে না—আবার যাহার চরিত্র খারাপ সে একেবারেই সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি। যেন স্মৃতিশাস্ত্র মাফিক স্বর্গ নরকের উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। বৃষভের মত সুর হইলেই বীররস হইল, আর নাকি-সুরে প্যাঁ প্যাঁ করিতে পারিলেই করুণ রস—আর কাতুকুতু দিয়া কোন গতিকে হাস্যরস জাগাইতে পারিলেই, শ্রেষ্ঠ নাটককার!

একটা মেস, একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী ও লম্পট একটা ছোকরাই আমাদের নভেলগুলির পুঁজি। বেদেরা যেমন একটা ভাল্লুক, একটা রামছাগল, আর একটা মর্কট লইয়া বাজী দেখাইয়া পয়সা উপায় করে—আমাদের নভেল লেখাও কতকটা সেই ধরণের। এতদিন কলিকাতার মেসে থাকিতাম—ঠাকুর চাকরের আদর যত্নে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হইবার উপক্রম করিল—কিন্তু পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে কোনো দিন "লভ্" করিবার সুযোগ পাইয়া এ নীরস জীবনটা সরস হইতে পাইল না তো! আমাদের সমাজশাসিত বৈচিত্র্যহীন জীবনে 'লভের' অবসর নাই, তাই কলিকাতায় আনিয়া মেসে ফেলিয়া লভ্ ঘটাইতে হইবে-ই—না হইলে plot খাড়া হয় না। পাশ্চাত্য দেশে যে সকল সমস্যা জীবন্ত হইয়া সমাজে দেখা দিয়াছে—বার্নার্ডশ্ বা হাউপ্টমান প্রভৃতির সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই সকল সমস্যার কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের সামাজিক জীবনে কোর্টসিপ নাই, elopement নাই, পরের স্ত্রী লইয়া বুলনাচ নাই, বিধবা বিবাহ নাই, সধবা বিবাহও নাই, divorce নাই, যুদ্ধ নাই, রাজ্য নাই,—সমাজ বিপ্লব নাই—কি

লইয়া নভেল লিখিব? এক বালবিধবার সহিত প্রেম—সে আর কত রকমে লেখা যাইবে? তাই পরের সমাজ হইতে ধার করা আইডিয়া লইতে হয়—কিন্তু বাঙ্‌লার মাটিতে সেগুলি নিতান্ত আগাছার মতই রহিয়া যাইতেছে।

জাতীয় জীবনের—সমাজ জীবনের প্রসার না হইলে, চঞ্চলতা না আসিলে, সমস্যা দেখা দিবে না সমস্যা না আসিলে যুগ-সাহিত্যের আবির্ভাব হইবে না।

কবিতার ভিতর দিয়া আমাদের সাহিত্য ফুটে নাই। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সকলেই পশ্চিমের পাকা শিষ্য। মিল্টন, বায়রণ, শেলি প্রভৃতির ভূত এই সকল লেখার পিছন হইতে উঁকি মারে। Sublime conception আমাদের সাহিত্যে নাই। Lyric genius বা গীতি-কবিত্ব আমাদের আছে বটে কিন্তু অনেক স্থলেই হরিনাম ফোড়ন দিয়া টপ্পা গাহিয়া আমরা সে গীতি-প্রতিভা নিঃশেষ করিয়াছি। রাধা কৃষ্ণ না জন্মাইলে আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন কবির পেশা উঠিয়া যাইত।

"সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি
প্রণয়ের বাঁশী, বিরহের ফাঁসি, হাঁসা কাঁদা গলাগলি।"

আমাদের কবিতার সম্বল এই কয়টি। আমাদের জাতের চরিত্র যেমন হালকা, সাহিত্যও তেমনি হালকা। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন ইহা কাঁচা বয়সের লক্ষণ—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ইহা ইঁচোড়ে পাকার লক্ষণ। এই কাঁচা অবস্থায় পাকা বন্ধ করিতে হইবে। বাঙ্‌লার সাহিত্য-প্রতিভা চিরন্তন শাশ্বত রসের অনুগামী সাহিত্যের সৃষ্টি করুক। তৃষ্ণাতুর পথিককে শুধু এক গেলাস ঘোলের সরবৎ না দিয়া

তাহাকে স্বর্গের অমৃতবারি দানে তৃপ্ত করুক। দু'দিনের কথা ভুলিয়া চিরসত্য, বিশ্বজননীকে অবলম্বন করিয়া মানব-জীবনের এবং জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে মনোযোগী হোক—তবেই আমাদের সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য নামের যোগ্য হইবে, জগতের নিকট আমাদের মা আদৃত হইবেন, বিজয়ের বরমাল্যে বিভূষিত হইয়া আবার আমরা অমৃতের অধিকারী হইব।

আর্টের সমজ্‌দারি

আমাদের দেশে আর্টের চর্চ্চা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। ভদ্রলোকের গৃহ এবং ইস্কুল-কলেজ হইতে কলাবিদ্যা নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সেকালে এই সকল বিদ্যা আয়ত্ত করা শিক্ষার একটি অঙ্গ ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা নায়ক নায়িকার কলাকুশলতার বহুস্থলে পরিচয় পাই। সুখের বিষয় এখন আবার কলাবিদ্যার চর্চ্চা কিছু কিছু আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে না কি কলা বিদ্যা প্রবেশ লাভ করিয়াছে —কিন্তু ভয় হয় সেটা কলা বিদ্যার শুদ্ধ সংস্করণ "কদলী বিদ্যা"য় পরিণত না হয়!

নিজে কলাবিদ্যা কুশল না হইলেও কলা বিদ্যার সমজ্‌দার হওয়াটাও বিশেষ দরকার। আমাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত তাঁহারা অন্যদিকে যতই শিখুন না কেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের মত গোমূর্খ কমই পাওয়া যায়। Æsthetics নামক জিনিষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই।

আমাদের স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, ব্যক্তিগত রুচি প্রকাশে কোনোখানেই জাতীয় আর্টের আদর নাই। বিদেশী আর্টের ঝুটা আমদানীতে আমাদের ঘরবাড়ী ছাইয়া গিয়াছে এবং একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই সকল নক্কলের অসঙ্গতি সহজেই চোখে পড়িবে।

সরু সরু গলি নর্দ্দমার গন্ধে পূর্ণ, দরজা জানালাহীনগৃহ ইহা লইয়াই আমাদের ভারতীয় নগরখ কিন্তু চাণক্যের অর্থশাস্ত্র, ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি পড়িয়া দেখিলে আমরা নগর বিন্যাসের কেমন সুন্দর পরিকল্পনা পাই। আমরা বাড়ী তৈরি করি—সে কোন্ আর্ট অনুসারে

জানি না—ভারতীয় কলার নিদর্শন মাত্র তাহাতে থাকে না। আমাদের ঘর বাড়ী ইঙ্গবঙ্গ এমন এক ফ্যাসানে প্রস্তুত হয় যাহার মধ্যে আর্টের 'আ'ও খুজিয়া পাওয়া ভার।

কেবল আমাদের মন্দির মস্‌জিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণে খানিকটা প্রাচীনভাব বজায় আছে। তবে মন্দিরের ভিতরকার ঠাকুরের উপর আজকাল অনেক রকম আর্ট চলিতেছে এবং মন্দিরের সাজসজ্জা আসবাবের মধ্যে বিলাতী জিনিসেরই প্রাধান্য হইতেছে। ইহার ভিতর অজ্ঞাতসারে যেখানে প্রাচীন আর্ট থাকিতেছে—সেখানেই সে কোনো প্রকারে বাঁচিয়া আছে।

আমাদের ঘরের আসবাবপত্র এবং সাজসজ্জার ভিতর ভারতীয় আর্টের কিছু মাত্র নাই। ছবিগুলি কেবল রং ঢালা, পোষাকপরিচ্ছদ সাহেবী পোষাকের বটতলা সংস্করণ মাত্র। আমাদের দেশের বড়লোকের বাড়ীর বাহিরে বিদেশী ঢঙের ন্যাংটা ষ্ট্যাচুর মেলা এবং ঘরের ভিতর ন্যাংটা মেমসাহেবের ছবির গুঁতো গুঁতি। কোচ, সোফা প্রভৃতিতে ঘর জোড়া। আমাদের সনাতন ফরাস আর তাকিয়া আজ কোথায় নির্ব্বাসিত! পোষাক পরিচ্ছদের তো কথাই নাই। বাপ মা পূজার সময় ছেলেকে একটি সাহেবী পোষাক কিনিয়া দিতে পারিলে ধন্য হন। যে সাহেবী পোষাক পরে না, তাহার পয়সার অভাব বুঝিতে হইবে। এই পোষাকের মধ্যে আর্ট নাই এমন কথা বলি না—কিন্তু তাহা বিদেশী এবং আমরা অনুকরণ করিতে যাইয়া সে আর্টের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া থাকি।

তারপর সূক্ষ্ম কলার কথা ধরা যাক। নৃত্য বিদ্যার বাস তো গণিকালয়েই হইয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে যে নাচিতে পারে এবং সেই নাচের ভিতর আবার একটা আর্ট থাকিতে পারে—ইহা আমাদের কল্পনারও অতীত। অথচ এই অসম্ভব ব্যাপারটা আজও

সাহেবদের ঘরে দুবেলা ঘটিতেছে এবং আমাদের দেশেও এককালে ঘটিত। ভদ্রলোকের সামনে নাচিতে পারে এমন দুঃসাহস যাত্রাদলের ছোকরা ভিন্ন এবং মেয়েদের মধ্যে থিয়েটারের গণিকা ভিন্ন আর কাহারও নাই।

তার পর সঙ্গীত। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে গান করিতে জানা—হয় খৃষ্টানী না হয় ব্রাহ্ময়ানীর লক্ষণ। দুঃখক্লান্তি-পীড়িত বাঙালী-জীবনে আনন্দের ফোয়ারা যেন শুকাইয়া গিয়াছে। সারাদিনের খাটুনির পর পুত্র কন্যাদের মধুর সঙ্গীতালাপে গৃহখানি ভরপূর করিয়া আনন্দের স্রোত বহানো আজকাল যেন একটা ভীষণ অসম্ভবের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। টপ্পা খেউড় প্রভৃতি হাল্‌কা সুরের গান হয়তো আমরা কিছু জানি, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের ধ্রুপদ খেয়াল এখন কেবল কালোয়াতের আসরে শ্রোতার হাঁই তোলায় মাত্র।

আর্টের সমজ্‌দারি চাই। গান শুনিলেই হয় না—গান বুঝিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করা চাই। সকল চারুকলার বিষয়েই এই কথা খাটে। আমরা গানের কথাগুলি শুনিয়া গান বুঝিতে চাই। এ যেন গল্প শোনা। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীর ষ্টাইলের কথা বলিতে গিয়া ইহাকে কালোয়াতী গানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। "চলতো রাজকুমারী" বলিয়া ওস্তাদ গান ধরিলেন, নানাভাবে নানাভঙ্গে ঐ একই কথা কতবার ফিরিয়া ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন—সমজ্‌দার শ্রোতা রসে ভরপূর হইয়া বাহবা দিতে লাগিল, আর যাহারা রাজকুমারীর আধ ঘণ্টার মধ্যেও কোথায় যাওয়া হইল জানিতে পারিলেন না তাঁহারা নিশ্চয়ই একে একে বিরক্ত হইয়া আসর পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্গীত যখন উচ্চ অঙ্গে যায় তখন রূপ ছাড়িয়া সে ভাবের মাঝারে নিজকে বিসর্জ্জন করিয়া ফেলে। তখন

সমজ্‌দারের কাণে কেবল সুরটাই ঘোরে—কথা কোথায় চলিয়া যায়। শেষে হয়তো শুধু শব্দবিহীন সাধাসুরের উপরই সমস্ত সঙ্গীতটি ঘুরিতে ফিরিতে থাকে। তাল মান লয় ঠিক থাকিলেই হইল—রাগ রাগিণীর সৌন্দর্য্যেই প্রকৃত সমজ্‌দার তখন আত্মহারা।

কবিতাতেও এইরূপ আকারটা অবলম্বন মাত্র। সেক্‌স্‌পিয়র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ওয়াণ্ট হুইট্‌ম্যান প্রভৃতির ভিতর হয় তো কথার রিনিঝিনি বেশী নাই কিন্তু ভাবের গাম্ভীর্য্যে, চিত্রণের বৈচিত্র্যে এত বড় সৃষ্টি কবিতারাজ্যে আর কাহার আছে? কেবল কথার মারপ্যাচ এবং কতকগুলি শ্রুতিমধুর শব্দের উল্টোপাল্টা সংযোগেই কবিতা হয় না। অবশ্য সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করাও আর্টের একটা দিক। কালিদাস, টেনিসন, সুইনবার্ণ, রবীন্দ্রনাথে এই আকার ও ভাবগত আর্টের বেশ সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। কিন্তু আকারটাই কবিতার সর্ব্বস্ব নয়। ঐটিকে আশ্রয় করিয়া কবিতার প্রাণ অন্তর্নিহিত থাকে। a^2+b^2+2ab এই ফরমুলায় কি মজা আছে যে শুধু a, b পড়িয়াছে সে বুঝিবে না—তাহাকে গণিতজ্ঞ হইতে হইবে। তাই শব্দ জানিলেই, ভাষার আকারের সহিত পরিচিত হইলেই কবিতা বোঝা যাইবে না—ভাবের সহিত প্রাণের যোগ স্থাপন করিতে হইবে। তবেই প্রকৃত সমজ্‌দার হইতে পারা যাইবে।

চিত্রেও তাই। ছবির বহিরাকৃতি নিখুঁত হইলেই আর্ট হইল না। তাহার জন্য তো ফটোগ্রাফ আছে। আর্ট কোথায়—ভাবের ব্যঞ্জনাতেই তো আর্ট। র‍্যাফেল অথবা লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি আজ যে অমর, সে কেবল গোটা কতক মানুষের চেহারা আঁকিয়া নয়, মানব প্রকৃতির মূল্যবান কয়েকটি ভাবের দ্যোতনাকে তাঁহারা অমর করিয়া গিয়াছেন।

মায়ের অনন্ত স্নেহ ম্যাদোনার ছবিখানিতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ভাব হিসাবে যে জিনিস মানব-জীবনে যতখানি বড় স্থান অধিকার করে, ছবিখানিও ততটা বড় স্থান আর্টে পাইবে। মনে করা যাক—একদল কুকুর একটি শেয়ালকে মুরগী চুরির সময়ে অতর্কিতে ধরিয়া ফেলিয়াছে —মুরগী, শেয়াল এবং কুকুরের সেই অবস্থায় যে ভাবটি হয় ঠিক সেই ভাবটি চিত্রকর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা বলিব ছবিখানি বেশ হইয়াছে। কিন্তু আর একচিত্রে দেখি মৃত্যুশয্যায় শায়িত সম্রাট্ সাজাহান আগ্রা দুর্গ হইতে একবার জনমের মত প্রিয় মমতাজের সমাধি দেখিয়া লইতেছেন—আর্ট হিসাবে এই ভাবের চিত্রের স্থান মানুষের জীবনে ঢের উঁচুতে। হয় তো শাজাহানের হাত পা ঠিক আঁকা হয় নাই—হয় তো তাজমহলের ছবিখানি তত স্পষ্ট বা নিখুঁত হয় নাই—কিন্তু ভাব-সম্পদে এই সুন্দর চিত্রখানি স্রষ্টাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। এক গেলাস ঘোলের সরবৎ খাইয়া কি আমোদ হয় একজন কবি খুব চমৎকার ছন্দে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দরিদ্রকে নিজের শেষ পয়সাটি দান করিলে কি সুখ হয় আর একজন কবি তাহা হয় তো নিকৃষ্ট ছন্দে কিন্তু ভাবের সহিত লিখিয়া গিয়াছেন—আমরা ভাবসম্পদের জন্য শেষোক্ত কবির নিকটই মাথা নত করিব।

অনেক সময় আমরা নিজদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অথবা অভ্যাসের দাস বলিয়া ভাল জিনিসকেও অবহেলা করি। যেমন ভারতীয় চিত্রকলা বলিতেই আমরা নাক সিটকাইয়া উঠি। জিনিসটা কি তাহা হয় তো একদিনও বুঝিবার চেষ্টা করিলাম না। ভারতীয় দর্শন কি, একদিনও বুঝিলাম না—অথচ ভারতীয় দর্শনের কথা উঠিলেই গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিব—এ যে বড় অন্যায়। ভারতীয় চিত্রকলা

বুঝিতে হইলে ভক্তির ভাব লইয়া কথাগুলি তলাইয়া বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্যতার এক একটি স্বতন্ত্র আদর্শ আছে। ভারতের তথা প্রাচ্যের আদর্শ অন্তর্মুখীন—পাশ্চাত্যের আদর্শ বহির্মুখীন। গ্রীক এবং রোমান আর্টের ভিতর চেহারার খুঁত পাওয়া যাইবে না। তাহার ভিতর অবাস্তবতা থাকিলেও তাহা বাহিরের আকৃতি হিসাবে নিখুঁত হইয়া ভিতরের সৌন্দর্য্যকে সমগ্রের সম্পূর্ণতার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবে। মনে করুন একটি নিখুঁত মানবের ছবি—যেমন সুন্দর চোখমুখ, তেমনি হাত পা, তেমনি সব—কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ নাই, পূর্ণতায় যেন চারিদিকের সৌন্দর্য্য ভরিয়া উঠিয়াছে। এখানে অবাস্তবতা এই যে এরূপ মানব আমরা সংসারে পাই না—সকলেরই কিছু না কিছু খুঁত আছে কিন্তু এ মানুষটি ঠিক যেটি হইলে আমরা সন্তুষ্ট হই তাই। এই realistic idealism পাশ্চাত্যের আদর্শ। ভারতের আদর্শ তাহার ঠিক উল্টা। কাউন্ট ওকাকুরা নামক জাপানী ভাবুক তাঁহার Ideals of the East নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, ভাবের দিক হইতে সমগ্র প্রাচ্য মহাদেশই—এক বারে এক "Asia is one"। তাই চীনা এবং জাপানী চিত্রকলার সঙ্গে তুলনা করিলেই আমাদের প্রকৃত ভাবটি ধরা পড়ে। দুঃখের বিষয় আমাদের আর্টের বিশেষত্ব আমাদের বুঝিতে এত দেরী হইতেছে। হ্যাভেল* সাহেব যখন আর্ট স্কুল হইতে বিদেশী ছবিগুলি বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ভারতীয় আর্টকে প্রথম স্থান দিলেন—তখন আমাদের দেশের সংবাদ পত্রের চীৎকারে তাঁহার প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। কিন্তু এখন ভাবুকমাত্রেই বুঝিতেছেন কি শুভক্ষণেই হ্যাভেল সাহেব এদেশে আসিয়া আমাদের চোখে আঙুল দিয়া আমাদেরই ঘরের রত্ন চিনিতে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

সিষ্টার নিবেদিতার মত পাশ্চাত্য রমণীও দেখিয়া শুনিয়া ভারতীয় আর্টের ভক্ত হইয়া উঠিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় জীবনের নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চিত্রকলার পুনর্জ্জন্ম হইল। সুদূর ফরাসী রুশিয়া ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সে চিত্রকলা সমাদর লাভ করিল। কেবল আমাদের ঘরের বিজ্ঞ সমালোচকগণ মুখ ফিরিয়াও চাহিলেন না। বলিলেন—

কি আগুন লাগিয়ে দিলে ছবিতে
দেখে প্রাণে জাগে কবিতে
রং বিরং এর অগ্নি কণা
হাত দুটো ঠিক সাপের ফণা
মানুষটাকে যায় না চেনা
মৎস্য কন্যা কিম্বা নারী
সেইটে বোঝাই শক্ত ভারী ইত্যাদি।

এই সকল সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় চিত্রকলার মূল ভাবটি কি বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমে বোঝা দরকার আর্টের আকারটাই সব নয়—ভাবটাই প্রধান। আমরা যখন কবিতায় পড়ি—

ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত
করিকর যুগবর জানু সুবলিত
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ইত্যাদি।

তখন যদি ভাবটি না ধরিয়া শুধু ভাষার কথায় কথায় ব্যাখ্যা করিয়া কবির বর্ণিত পুরুষকে ছবিতে আঁকি, তাহা হইলে চেহারাখানা কিরূপ

দাঁড়ায় মনে করুন তো! গলায় গলগণ্ড—তাহার উপর সুদীর্ঘ দাড়ি হইলে তবে সিংহগ্রীব হইবে, আর শুঁড়ের মত জানু হইতে হইলে Elephantiasis রোগের সাহায্য লওয়া ছাড়া উপায় নাই। পটল চেরা চোখ, এবং চাঁদের মত মুখ হইলেই তো সর্ব্বনাশ; অতখানি চোখ, ঐরূপ গোলাকার কলঙ্কযুক্ত মুখ—কে ভাল বলিবে জানি না! তাই শুধু ভাবটার ব্যঞ্জনামাত্র গ্রহণ করিতে হইবে—এ বিষয়ে কবিতাতেও যা, চিত্রেও কতকটা তাই।

ভারতের অন্তর্মুখী সভ্যতার আদর্শ অনুসারে বাহিরের আকারের প্রতি ভারতীয় চিত্রকলা তেমন নজর দেয় নাই। তাহার অর্থ এবং সার্থকতাও আছে।

অবনীন্দ্রনাথ একস্থলে বলিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্র আঁকিতে হইলে তিনি কলেজ স্কোয়ারের সেই আধখানা মাথা কামানো কাট খোট্টা আকৃতিটি আঁকিবেন না। দয়ার সাগর গুণের বারিধি পরদুঃখে বিগলিত প্রাণ একজন বাঙ্গালীর মূর্ত্তি ধ্যান করিলে তাঁহার মনে যেরূপ আসে তিনি সেইরূপ আঁকিবেন—তাতে সে আসল চেহারার সঙ্গে মিলুক আর না মিলুক। এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা—শুনিয়া সকলে হয়তো অবাক হইবেন! কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় চিত্রকলা এই ভাবেই চলিয়াছে। দীর্ঘ ছয় বৎসরের কঠোর তপস্যা ও অনশনের পর শাক্যসিংহ যখন দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ হইলেন, ভারতীয় শিল্পী তাঁহাকে জ্ঞানের পূর্ণদীপ্তিতে ভাসমান এক সুডৌল সোণার আকৃতি প্রদান করিল। এই আকারের ভিতর তাঁহার ভিতরকার spiritual life এর পূর্ণতা প্রকাশ করিল। যাঁহারা বুদ্ধদেবের এই অবস্থার আকৃতি দেখিয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন কেমন সুন্দরভাবে ভিতরকার এই মস্ত

বড় জীবনটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার অভিব্যক্তি কি চমৎকার হইয়াছে! এই খানেই ভারতীয় চিত্রকলার বিশেষত্ব। পাশ্চাত্য শিল্পী হইলে ছ'বৎসর উপবাস ও তপ সাধনার পর মানুষের ঠিক যেরূপ চেহারাটি হয় সেইরূপ আঁকিতেন। কিন্তু তার জন্য একজন ফটোগ্রাফার থাকিলেই চলিত। বুদ্ধদেবের প্রাণে কি পূর্ণতা আসিয়াছে শিল্পীকে ধ্যানবলে তাহা অনুভব করিতে হইবে এবং দ্রষ্টাকে ভক্তকে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে—ইহাই ভারতীয় শিল্পীর আদর্শ। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিই তাহাকে বাহির ভুলাইয়াছে। আত্মাশক্তির মহাশক্তির প্রসার বুঝাইতে হইবে—শিল্পী অমনি দশদিকে তাঁহার দশখানি হাত সৃষ্টি করিয়া দিলেন। রাস্কিনের ন্যায় পণ্ডিতলোকেও ইহার অর্থ না বুঝিয়া ভারতীয় শিল্পকলাকে barbaric বলিবেন—কিন্তু ভারতবাসী আমরা আমাদের হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন জিনিষকে না বুঝিয়া কেন যে তাহাদের সুরে সুর মিলাইতে যাই—তাহাই ভাবিয়া পাই না।

এ সম্বন্ধে ডাঃ কুমারস্বামী, হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের পুস্তকগুলি পড়িলেই সকলে কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিবেন। রবিবর্ম্মার ছবির আদর দেশে চিত্রকলার সমাদর নাই ইহাই বুঝাইয়া দেয়।

আর্টের সমজ্‌দারি শিখার বিষয়। কাব্য বুঝিতে হইলে মনকে শিখাইতে হইবে, গান শুনিতে হইলে কানকে তৈয়ারী করিতে হইবে। চিত্র বুঝিতে হইলে চোখকে ঠিক ঠিক দেখাইতে হইবে, তবে সমজ্‌দারি সম্পূর্ণ হইবে। শুধু কতকগুলি পোষা ধারণায় মনকে বাঁধিয়া রাখিয়া অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আর্ট ও জীবন

সৃষ্টির উপর মানুষের ওস্তাদির চেষ্টাতেই আর্টের সূত্রপাত। স্বভাবে যেটি যেমন আছে তাহা হয়তো আমাদের অভাব ঠিক ভালভাবে পূরণ করে না, কিম্বা সে ভাবে থাকিলে আমাদের মনঃপূত হয় না—তাই আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিটুকু দিয়া তাহার উপর একটু কারিগরি চালাইতে যাই।

আর্ট যে শুধু মানুষেরই একচেটে তাহা নয়। প্রাণীদের মধ্যেও সুন্দর আর্ট দেখা যায়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে তফাৎটা এই যে, মানুষের আর্ট—ক্রমোন্নতিশীল, তাহার পরিবর্ত্তন নিত্যই হইতেছে—প্রাণীদের আর্ট প্রায় যেমন তেমনই আছে। আত্মরক্ষাহেতু চেষ্টা মানুষকে আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, রাঁধিতে শিখাইল, কাপড় পরাইতে শিখাইল—আরও কত কি শিখাইল। এই সমস্ত আর্টের আবিষ্কর্ত্তা মহাপুরুষদিগের নাম পর্য্যন্ত মানব আজ ভুলিয়া গিয়াছে।

প্রথম অবস্থায় প্রয়োজনের সীমাতেই আর্ট আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষের অনুকরণ প্রবৃত্তি এবং সৌন্দর্য্যবুদ্ধি আসিয়া প্রয়োজনকে ছাপাইয়া আর্টকে এক নূতন সাজ দিল। কাপড় দরকার—তাহার চারিধার শক্ত হওয়া দরকার—নানা রং-বেরংএর সূতা তৈয়ারি হইল—কত লতা পাতা ফুল জমির উপর বসানো হইল—পাড়ের কত রকম বাহার হইল—অবশেষে কাপড়ের চরম মসলিনে পরিণত হইয়া সে তাহার প্রথম উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয়তার কথাই ভুলিয়া গেল। তখন সেই সুন্দর মসলিনের নীচে আর একটা কিছু না পারিলে লজ্জারক্ষা বা প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হয় না! এমন কি অনেক সময় চীন-সুন্দরীর

জুতা-পরার ন্যায় ইহা একটা উৎপাতের আকারই ধারণ করিয়া বসে।

এই গেল material আর্টের কথা। ইংরেজীতে যাহাকে fine arts বলা হয় এইবার সেই চারু শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ভাস্কর্য্য চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মূলে অনুকরণ প্রবৃত্তি, নিজের সৌন্দর্য্য অনুভূতির প্রকাশ ও ওস্তাদি দেখানোর চেষ্টা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সৃষ্টিতে যেটি আছে সেটি আমিও সৃষ্টি করিব—আমার যেটা ভাল লাগিয়াছে, সুন্দর মনে হইয়াছে—তাহাকে আমার আয়ত্তের ভিতর আনিয়া আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া অমরত্ব দান করিব। যাহা দূর গগনের অসীম নীলিমায় লীন হইয়া আছে তাহাকে রং ও তুলিতে ধরিয়া ঘরের ভিতর বাঁধিয়া রাখিব, যাহা মরণের অজানা গভীরে ডুবিয়া যাইতেছে তাহাকে পাথরের ভিতর ফুটাইয়া তুলিয়া নয়ন সম্মুখে ধরিয়া রাখিব। আমার মনে, আমার কল্পনাতে যাহা এত সুখ দুঃখের ঢেউ তুলিয়াছে তাহাকে ছন্দ ও গীতের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিব—মানুষের চলিত ভাষাতে বিনা চেষ্টায় যে রূপটি মিষ্ট মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠে, আমি আমার অন্তরের কথা মরমের ব্যথা সমস্তটাকেই সেই মিষ্ট-মধুর ছন্দের তানলয়সংযোগে গাহিয়া শুনাইব—আমার নিভৃতের মরম কথা, জীবন নিশার গোপন স্বপনগুলি রঙীন হইয়া শব্দের হিল্লোলে, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় অমর হইয়া মানুষের চির আদরের সামগ্রী হইবে।

যখন দেখিলাম মানুষ আমার সৃষ্টিতে ভুলিল, প্রকৃতির কোকিল-কণ্ঠের তান যখন মানবের মনপ্রাণ হরণ করিল, তখন আর্টের হারমোনিয়মের ভিতর দিয়া আমি সেই সুর, সেই পঞ্চম ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলাম। এইখানেই আর্টের প্রকৃত জন্মলাভ। ইংরেজীতে

art এবং artificial কথা দুইটি বুঝিলেই আর গোলমাল থাকিবে না। Art আর্টই Nature নয়।

এ আর্টের সহিত বাস্তব অনুভূতির সম্পর্ক সদাবদ্ধভাবে না থাকিতে পারে। তুমি সাবিত্রীর চরিত্রে মুগ্ধ হও—আমি স্বৈরিণী হইয়াও সেই চরিত্রের পালা অভিনয় করিয়া তোমায় মুগ্ধ করি। তুমি আমি কিছুক্ষণের মত এক কল্পলোকে চলিয়া যাই—আমি নানা আর্টের ভিতর দিয়া সাবিত্রীর ভাবটি তোমার সম্মুখে দেখাইতে চেষ্টা করি, তুমিও নিজেকে ও আমাকে ভুলিয়া, জীবনের বাস্তবের কথা স্মরণ না করিয়া —মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই ভাবের ইঙ্গিতে নিজের মনকে নাচাইতে থাক।

তাই মনে হয় জীবনের সহিত খাঁটি আর্টের সম্পর্ক কতটুকু? যতটুকু অভিনয় ততটুকু মাত্র। স্বদেশ-প্রেমের কবিতা লিখিলেই কবি সত্যই যে খুব স্বদেশ প্রেমিক হইবেন এমন নয়, ভগবৎপ্রেমের কবিতা লিখিলেই কবি যে সত্যই ভক্ত হইবেন, একথা মনে করিলে অন্যায় হইবে। আমি যে রূপটি, যে চিত্রটি, যে কথাটি ভালবাসি, তিনি সেইটী বুঝিয়া আমার মনের সম্মুখে সেই নয়নমনোরম ভাবটি এমন করিয়া ধরিয়া দিতে জানেন যে তাহাতে আমি মুগ্ধ না হইয়া পারি না। বৃদ্ধা বেশ্যার কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা চোখের জলে ভাসিয়া যাই—অভিনেত্রীর অভিনয়ের প্রভাবে আমরা চটিয়া জুতা ছুড়িয়া মারি—এইখানেই আর্টের চরম সার্থকতা। চণ্ডীর গান গাহিয়া, আসরে গেরুয়া পরিয়া যে শ্রোতার মন হরণ:করে—সে যে মায়ের অসাধারণ ভক্ত হইবে এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কবি ও কাব্যের ভাবের সঙ্গে ঐ ক্ষণিকের একতা—তবে তিনি কল্পনায় বা আর্টের সাহায্যে ক্ষণিকের জন্যও যতটা উঠিতে পারেন

আমি তাহা পারি না, তাই আমি কবি বলিয়া তাহাকে উচ্চাসন দিই, কিন্তু সাধক বলিয়া তাহাকে পূজা করিব না।

আর্টের সঙ্গে জীবনের সম্পর্কটি বুঝিলেই, অভিনয় ও সাধনার প্রভেদ বুঝিলেই আর গোলমাল থাকিবে না। আর্ট এবং জীবনের বিষয়ে এই তথ্যটুকু না বুঝিয়াই আমরা অলিতে-গলিতে ঋষির সৃষ্টি করি—নিজের সাধনা নাই, শক্তি নাই বলিয়া আদর্শটাকে এতই ছোট করিয়া ফেলি।

হালকা সাহিত্য

কি কুক্ষণেই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে নভেল লেখার পথ দেখাইয়াছিলেন —আর রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্পের অবতারণা করিয়াছিলেন! বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভিতর ওস্তাদের হাত ছিল—কিন্তু তাঁহাদের শিষ্যগণ মক্‌স করিতে করিতে ব্যাপারটা এমন একটা বীভৎস করিয়া তুলিয়াছেন যে, এই শিব গড়িতে বানর গড়া বিষয়ে এখন দু'চার কথা না বলিলে চলে না।

স্বীকার করি, সাহিত্য কাহারও ফরমাস মত গড়িয়া উঠে না। শস্যের সঙ্গে আগাছাও অনেক জন্মিবে। সকল মুকুলেই ফল ধরিবে, তাহা নয়। গাছ ভরিয়া মুকুল আসিবে—ঝড়-বাদলে অনেক ঝরিয়া যাইবে—কতকগুলি কেবল প্রকৃতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফলরূপে সাফল্য লাভ করিবে। কিন্তু গাছের চেয়ে আগাছার বাহুল্য ঘটিলে আসল গাছটাই মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাই আগাছা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। বাংলা সাহিত্যের তাই হইয়াছে। যে সাহিত্যের বয়স আজও শতাব্দী পার হয় নাই, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার সেদিন যাহার বীজ বপন করিলেন, ভাল বইএর সংখ্যা যেখানে আঙুলে গণিয়াই শেষ করা যায়—সেখানে হালকা সাহিত্যের বৃদ্ধি দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। আমাদের সাহিত্য ঠিক যেন একটি ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ছোট ছেলে—মাথাটি ছোট, গলাটি সরু, পেটটি মোটা—কুপথ্যে পেটজোড়া লিবারপিলে। পড়িতে গেলে দুদণ্ড ভাবিতে

হয়, কিংবা পড়ার পর মনে একটা আন্দোলন আনিয়া দেয়, বাঙলা সাহিত্যে এমন বই কয়খানা আছে? অবশ্য সব বই-ই যে এমন হইবে তাহা নয়। মানুষের আমোদের জন্য, ক্ষণিক সুখের জন্য একশ্রেণীর সাহিত্য চাই—কিন্তু সমগ্র সাহিত্যটাই সেই তরল সাহিত্যের প্লাবনে ভাসাইয়া দিলে তো চলিবে না।

বাংলাদেশে বিজ্ঞ এবং সর্ব্বজ্ঞ লোকের সংখ্যা কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছে—তাঁহারা সংসারের সব বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। তাই বড় বড় বিষয়ে মাথা ঘামাইয়া আর কি হইবে, এরূপ মনে করেন। অবশ্য পেটের চিন্তাই বাঙালীর মাথা খাইয়াছে। ডাঁটা চচ্চড়ি ও ভাত খাইয়া দিনরাত কলম পিষিয়া মানুষের প্রাণ একটু আরাম খুঁজিতে চায়। পয়সা থাকিলে এবং প্রবৃত্তি থাকিলে অনেকে এই আরামটুকু যে ভাবে উপলব্ধি করেন তাহা নাই বলিলাম; যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহারা ঘরে বসিয়া চোখ বুজিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকেন, আর যাঁহারা অতটা জড় ন'ন, তাঁহারা তাস খেলিয়া অথবা নভেল ও গল্প পড়িয়া আড্ডা দিয়া অবসরটুকু কাটান। ছাত্রেরা বাপমার পয়সা ধ্বংস করিয়া এই সাহিত্যের লেখকদিগকে patronise করেন আর আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা বাহ্য জগতের সম্পর্ক হইতে বিচ্যুত হইয়া এই সকল নভেলের সাহায্যে বাহিরের লীলাখেলার আভাস গ্রহণ করেন।

কাজেই নভেল ও গল্পের পাঠক পাওয়া যায়। বাঙলা দেশে বই কিনিয়া পড়ার প্রবৃত্তি খুব কম লোকেরই আছে। বেশীর ভাগ লোক চাহিয়া পড়েন, অনেক লোক ফেরৎ না দিবার উদ্দেশ্যেও চাহিয়া লইয়া পড়েন, কিন্তু কেনার লোক নাই বলিলেই হয়—বিশেষতঃ বইখানি যদি একটু উঁচু ধরণের হয় এবং তাহাতে ভাবিবার কথা কিছু থাকে।

নভেল ও গল্পের আদরটাই খুব বেশী ; গ্রন্থকারগণ অনেক সময় পয়সার লোভে ঐ দিকেই ঝোঁকেন—তাতেই দেশে এত নভেল, এত গল্পের ছড়াছড়ি।

আমাদের রুদ্ধ সমাজ-জীবনের বৈচিত্র্য নাই, পরাধীন জাতীয় জীবনে সমস্যা নাই, বিশ্বের সহিত যে যোগাযোগ তাহার সূত্রটি অন্যের হাতে—তাই আমাদের দেশে প্রাণবান সারবান সাহিত্য এখনো গড়িয়া উঠে নাই। সমাজ-জীবন যেমন হাল্‌কা, সাহিত্যও তেমনি হাল্‌কা। আর সবই একঘেয়ে। সেই থাড়া বড়ি থোড় এবং থোড় বড়ি থাড়া। ফিরিয়া ঘুরিয়া সেই বাল-বিধবাকে লইয়া টানাটানি—তাহাকে প্রেমে ফেলিতেই হইবে কারণ সে যেন সমাজে ঐ কাজের জন্যই বেকার বসিয়া আছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের মনের কত কলুষিত ভাব প্রকাশ পাইতেছে—জীবনে যাহার চরিতার্থতার সুবিধা নাই—বিফল প্রাণের সেই লালসাময় ঘৃণিত আশা-আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যের আকার ধারণ করিয়া বাজারে চলিয়া যাইতেছে।

পতিতা নারীদিগের জন্য বাঙলা সাহিত্যিকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কার্য্যত উদ্ধার করিবার চেষ্টা বা সাহস নাই কেবল কলুষিত মনের খোরাক জোগাইবার জন্য এই সকল চরিত্রের অবতারণা। এক শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে আর কোনও সাহিত্যিকের নিকট তো এ সম্বন্ধে জীবনের একটা গভীর সহানুভূতি পাই না, শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজাইতে গেলে তো চলিবে না।

একটা বাঁধা-ধরা উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিলে সে সাহিত্য প্রাণহীন হয়। সাহিত্য লোকশিক্ষা দেয় বটে, কিন্তু তাহা গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড লইয়া নয়, কিম্বা স্মৃতির বিধান দিয়া নয়। ধর্ম্মপ্রচারকের কাজ

ও সাহিত্যিকের কাজ এক নয়। জীবনের গভীরতর সত্যগুলির সহিত আমাদের দৈনন্দিন কাজের অসামঞ্জস্য দেখাইয়া নানারসের অবতারণা করিয়া মোলায়েম করিয়া সমাজকে শিক্ষা দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। মানুষের মনকে উঁচু দিকে লইতে চেষ্টা করাই দরকার—তাহাকে নরকের পথে আরও খানিকটা ঠেলিয়া দিয়া মজা দেখা, আর বই বিক্রয় করিয়া পয়সা করা ভাল ব্যবসা নয়।

প্রকৃত সাহিত্যিক যে সমাজের মনের মত কথাই কহিবেন, তাহা নয়। প্রথমশ্রেণীর সাহিত্য প্রায়ই প্রথমে লোকে তারিফ করিতে পারে না। কিন্তু খাঁটী জিনিষের আদর জগতে হইবেই। সাহিত্যিকের সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজকে দিবার অনেক আছে। স্পেনের Cervantes, ও আমেরিকার Mark Twain এবং আমাদের দেশে দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরসের ভিতর দিয়া কি অমৃতরসের সৃজন করিয়া গিয়াছেন। মিছরির ছুরি দিয়া সমাজদেহে যে অস্ত্রোপচার করিয়া গিয়াছেন—তাহার আর তুলনা নাই। হাল্‌কা সাহিত্য থাকুক, কিন্তু আর সব দিক ছাড়িয়া শুধু ঐটার দিকে সকলে না ঝুঁকিলেই দেশের কল্যাণ। যা-তা খাইয়া পিলে-লিবার-জোড়া পেটটি মোটা করিলেই চলিবে না—মাথাটাও যাহাতে বাড়ে এবং দেহের সুষমা ও সৌষ্ঠব যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সাহিত্য-সাধকগণের সে চেষ্টায় ব্রতী হইতে হইবে।

মরণ-লীলা

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা।
নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষো ধর্ম্মঃ ॥

—কঠোপনিষৎ

আমাদের এই এক ছটাক বুদ্ধি ত্রৈরাশিক কষিয়া বলিয়া দিল—অমুক কাজটা অন্যায় হইয়াছে, এইরূপ হইলে ঠিক হইত। কিন্তু বিশ্ববিধাতা কি নিয়মে ত্রৈরাশিক করেন, তা বুঝিতে মহা মহা পণ্ডিতের বুদ্ধিও হার মানে। শ্লাভজাতীয় একজন যুবক অষ্ট্রীয়ার যুবরাজের প্রাণসংহার করিল, তাহাতে বিশ্ব জুড়িয়া যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কোটি কোটি মানব পরিবারের হৃদয়-ভাঙ্গা অশ্রু-ধারার প্রবল স্রোতে সে আগুন নিবিল না—একজনের পাপে লক্ষজনের কেন এ শাস্তি, আমাদের ত্রৈরাশিক তাহা বলিয়া দিতে পারিল না। মস্ত একটা ঝড় আসিল—শিলাপাতে, বজ্রাঘাতে কত প্রাণহানি, কত নির্দ্দয় ক্ষতি সংসারের উপর নিমিষে আসিয়া পড়িল; আমাদের মধ্যে যাহার বুদ্ধি একটু কম সে বিধাতার নিন্দাবাদ করিল; যাহার খানিকটা বুদ্ধি আছে, সে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াই চুপ করিয়া রহিল, আর যাহার দৃষ্টি আরও একটু সূক্ষ্ম সে এই সংসার-লীলার অন্তরালে মস্ত বড় একটা মঙ্গলের ইঙ্গিত পাইয়া ভক্তিভরে গাইয়া উঠিল—

"এই তো ঝঞ্ঝা তড়িত-জ্বালা,
এইতো দুখের অগ্নিমালা,
এইতো মুক্তি, এই দীপ্তি,

এই তো ভালো—
এই তো আলো—
এই তো আলো।"

বৈজ্ঞানিক আসিয়া বলিলেন—জীবন-মৃত্যু একগাছি শিকলের Link মাত্র—এ কেবল ঢেউএর ওঠা নামা।

"সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হলে
নদী হ'য়ে গল্‌বে।
ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে' আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে
মরণে ফল ফলবে।"

ভক্ত আসিয়া বলিলেন—

"রোগ শোক দারিদ্র্য যাতনা ধর্ম্মাধর্ম্ম
সুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা জীবে
বল কেবা কিবা করে।

উল্টো কথা

দার্শনিক ঋষি বলিলেন—

"ন জায়তে, ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ,
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো, নিত্যঃ, শাশ্বতোঽয়ং, পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
—"আত্মা জ্ঞানময়, নাহি জনম, মরণ,
না হন উৎপন্ন, না করেন উৎপাদন
স্ব-রূপেতে সুগোচর
বর্ত্তমান নিরন্তর।
সদা কাল নব, নাহি বৃদ্ধি, নাহি ক্ষয়,
শরীরের ধ্বংসে তার ধ্বংস নাহি হয়।"

বিনাশ কোথায়? জগতে বিনাশ নাই।

"না সতো বিদ্যতে—ভাবো, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই কথা বলিয়াছেন। তবে আমরা বিনাশকে এত ভয় করি কেন? না চিরকাল হইতে ভাবিয়া আসিয়াছি—মরণের ব্যথা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস।

জানি, মরণের মত ধ্রুব এ সংসারে আর কিছুই নাই। তুমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, আমি কৌপীন-মাত্র-সম্বল পথের ভিখারী—কিন্তু অন্তিমে তোমার জন্যও যে সাড়ে তিন হাত জমি, আমার জন্যও ঠিক তাই। কিন্তু আমরা সংসারে সর্ব্বদাই এমনভাবে চলি যেন আমাছাড়া আর সকলকেই মরিতে হইবে; আমি যেন সংসারে চিরদিন দেখিতে শুনিতে আর ভোগ করিতে আসিয়াছি। মরণকে বেশ ভয় করি, সময় সময় অপরকে মরিতেও বলি অন্ততঃ উপলক্ষ

বিশেষে মরিলে প্রশংসাও করি ; এমন কি, সাময়িক উত্তেজনা বশে কিম্বা তথা-কথিত একটা আদর্শের প্রেরণায় হয়তো নিজের বহুমূল্য প্রাণটাও বিসর্জ্জন দিয়া ফেলি।

মানুষ জরায় মরে ; রোগে মরে ; জড় বা চেতন কোনো প্রাকৃতিক শক্তির হাতে মরে ; সময় সময় নিজে নিজেও মরে—কখনো বা বাইরের ঠেলায়, কখনো বা অন্তরের প্রেরণায়। একটা লোক বুড়ো হইয়া মারা গেল, তাহার জন্য তত দুঃখ করিলাম না—বলিলাম—"নাতিপুতি রেখে বেশ গিয়েছে।"

একজন রোগে ভুগিয়া মরিল, মানুষের হাতে যা উপায় আছে তা প্রয়োগ করা গেল—ডাক্তারে বাঁচাইতে পারিল না—দুঃখ হইল, কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, মনের এক কোণে এই তৃপ্তিটুকু জাগিয়া রহিল। বজ্রাঘাতে—ভূমিকম্পে মানুষ মরিল কষ্ট হইল—কিন্তু প্রকৃতির উপর হাত নাই—সহ্য করিতে হইল। নৌকা ডুবিয়া, রেলে চাপা পড়িয়া অথবা বাঘের মুখে কেহ মারা পড়িল—এতে দুঃখের মাত্রা কিছু বেশী হইল, কেননা ইহার প্রতিকার হয়তো অনেকটা আমাদের আয়ত্বের মধ্যেই ছিল। তারপর একটা লোক নিজেকে নিজেই মারিল—বড় দুঃখ হইল—কেননা এ মরা, না মরাটা তাহার নিজের হাতেই ছিল। কিন্তু এই নিজের উপর হাতটা থাকিলে বোধ হয় কবির আক্ষেপের প্রতিকার গোড়াতেই হইয়া যাইত, তাহা হইলে কাঁদিয়া বলিতে হইত না—

"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে
হ'য়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে!"

আত্মরক্ষা হেতু সমাজ নির্দ্দেশ করিলেন—আত্মহত্যা মহাপাপ।

উল্টো কথা

আমরা ছেলেবেলা হইতে তাই শুনিয়া আসিতেছি—সুতরাং আমাদেরও বিশ্বাস আত্মহত্যা মাহপাপ। বিংশ শতাব্দীতে নরকের ভয় অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজকে তেমন বিচলিত করে না—তবুও সেই যুগযুগান্তের অভিজ্ঞতার উপর গড়া এই বিশ্বাসটি অনেকের মনেই বেশ অচল অটল হইয়া আছে। আবার অসুখ হইল, তেমন যত্ন লইলাম না। বেশ অত্যাচার চালাইতে লাগিলাম—মরণের মুখে যাইতে হইল—এর নাম কি আত্মহত্যা নয়? হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, দুরাকাঙ্ক্ষা—"স্বদেশ প্রেম" নাম লইয়া লক্ষ নরের মুণ্ড চাহিল—আমরা স্বদেশিকতার দোহাই দিয়া তাজা মাথাগু'ল রাষ্ট্র-রাক্ষসীর হাড়কাঠে আগাইয়া দিলাম—জানিয়া শুনিয়া মরণের মুখে প্রবেশ করিলাম—দেশের লোক ধন্য ধন্য করিল, বলিল,—কি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ। এ আত্মত্যাগ আত্মহত্যার নামান্তর নয়? স্বামী মৃত—পতিই সতীর গতি—ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক অবলাকে চিতায় ভস্মীভূত হইতে হইল—ঢাকের শব্দে মানবপ্রাণের আর্ত্তনাদ কোথায় ডুবিয়া গেল—লোকের কোলাহলে সতীর জয় জয় নাদে উৎপীড়িতের গভীর যাতনার কথা কেহ টেরও পাইল না! এই পুণ্যময় স্বর্গপ্রাপ্তি—বীভৎস নরহত্যা কিম্বা আত্মহত্যা নয়? তবে ধর্ম্মের নামে এই সব অনুষ্ঠান হওয়ায় ইহাতে নরহন্তার ফাঁসি নাই! কিম্বা আত্মহত্যাকারীর নিন্দা নাই? কিন্তু বিশ্বের বিধাতা যিনি তাঁহার চক্ষুতো চিতা-ধূমে রুদ্ধদৃষ্টি হয় নাই!

তবে একটা কথা আছে—স্থল বিশেষে আমরা মানুষের মরণের—স্বকৃত অথবা পরকৃত—প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না—আমরা এমনই সংস্কারবদ্ধ জীব। মাতার ধর্ম্মনাশে উদ্যত—দুর্বৃত্তের

বিনাশকারী পুত্রকে আমরা সাধুবাদই করিয়া থাকি—যদি সে নরহন্তা বই আর কেহই নয়। আমরা সংস্কারবশে অথবা স্বার্থের প্রেরণায় যে আদর্শকে মহান বলিয়া প্রচার করি—তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক তাহার জন্য লোকে প্রাণদান করিলে জয় জয়কার করি—এমন কি ধর্ম্মের নামে অথবা আইনের বলে মানুষকে মারিবার জন্য নিযুক্ত করিতেও কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হই না। ধর্ম্মের নামে খ্রীষ্টশিষ্য নিজের ভাই মানুষকে আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছে—এক হাতে কৃপাণ—আর এক হাতে ধর্ম্মগ্রন্থ রাখিয়া প্রাণের বিনিময়-মূল্য জগতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে—স্বদেশ-প্রেমের নামে দেশে দেশে "কনস্‌ক্রিপসন" আইন জারি করিয়া মানুষ মানুষকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরমেধ যজ্ঞের হোতা করিয়াছে। রাজপুত-রমনী চিতায় প্রবেশ করিয়াছে—সাধু প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—আমরা ধন্য ধন্য করিয়াছি সেটা আমাদের সংস্কার অনুযায়ী হইয়াছে।

পতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—জীবনের সুখ দুঃখের একমাত্র উৎস অভাবে আজ সতীর প্রাণ প্রবাহিনী শুষ্কপ্রায়, দেহে চৈতন্য রহিল না—পতির অবলম্বিত সেই অজানা পথে প্রাণ-পাখী উড়িয়া গেল। সংসারের বিজ্ঞ হিসাব-বুদ্ধি দাড়ি নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"আহা, বেঁচে থাকলে মেয়েটির দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের কত উপকার হতো, হতভাগিনী নিজের এই দুঃখটুকু পরের মুখ চেয়ে সয়ে থাকতে পারল না!" সঙ্গে সঙ্গে সংসারের এই বিজ্ঞবুদ্ধির রায়ে শাস্ত্র আসিয়া সায় দিয়া এই ধারণাটাকে খুবই পাকা করিয়া দিল। কিন্তু সৃষ্টি-ছাড়া একটা হিসাব-ভোলা-ক্ষ্যাপা কোথা হইতে আসিয়া বলিয়া গেল—"হায়, নিষ্ঠুর স্বার্থময় সংসার, কেবল নিজের সুখের কথাটাই ভাব্‌লে; কে বলেছে ও বেঁচে থাকলে তোমাদের

আশা পূর্ণ হতো, ও পাগল হয়ে গিয়ে হয়তো সারা জীবন নিজেও দারুণ দুঃখ পেতো, আবার সংসারেরও মহাদুঃখের কারণ হয়ে থাকতো। আমার প্রভু, জগতের প্রভু ভোলানাথ মহেশ্বরই এ হিসাব জানেন। তিনি তাঁর বুদ্ধিতেই কাজ করেন—তুমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি তার কি বুঝবে বল? "মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ—জীবন রমণ লীলার ভিতর দিয়ে রুদ্র এই কথাই যে অহরহ তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন।"

আমরা হিসাব করিয়া দেখি প্রেমাবতার খৃষ্ট ছয়মাস ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বারো জন শিষ্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি জানিয়া শুনিয়া নিতান্ত বোকার মত অল্প বয়সে নিজের অমূল্য জীবনটা বিসর্জ্জন দিলেন—আহা অমন লোক যদি আর বিশ পঁচিশ বৎসর বাঁচতেন, না জানি তাহা হইলে কিনা করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু ঐ নিরীহ লোকটি না মরিয়া যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ত্রৈরাশিকের নিয়ম অনুসারে ছয়মাসে বারোজন হিসাবে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে কয়টি শিষ্য পাইতেন, প্রাণদান করিয়া নিজের মহত্ত্ব প্রভাবে আজ তিনি তাহার কোটিগুণ শিষ্যলাভ করিয়াছেন—মৃত্যু দিয়াই তিনি প্রাণকে পাইয়াছেন—

"সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেইত তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ।
সেইত—তোমার প্রাণ।"

জার্ম্মাণ অধ্যাপক পণ্ডিতরত্ন হিকেলের কথায় বলি—"যদি জীবনে আমার কোনো জিনিসে অধিকার থাকে, তবে সে আমার নিজের প্রাণ এবং তার যদিচ্ছা ব্যবহার।" অবশ্য ইহার দ্বারা আমি সমাজের পক্ষে

অনিষ্টকর সচরাচর যে সব আত্মহত্যা হয় তাহার পূর্ণ সমর্থন করিতেছি না।

ক্ষুধার জ্বালায়, ক্রোধের বশে, লোকলজ্জায় কতজন আত্মহত্যা করিতেছে—সেগুলির নিবারণ সমাজ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব—সমাজের বিচারবুদ্ধিতে যাহা মঙ্গলজনক সেই জীবন রক্ষা ব্যাপারটা একান্ত আবশ্যক। তাই সমাজ ব্যক্তির নিজের জীবনের ঐ যদিচ্ছ ব্যবহার ক্ষমতার উপর হাত দিতে চায়, তাই আত্মহত্যার এত নিন্দা। কিন্তু সকল জিনিসেরই একটা ভাল মন্দ আছে, মানুষ খুন করাও যেমন সময় সময় সমাজে সমর্থিত হয়—যেমন মাতার ধর্ম্মনাশকারীর প্রাণবধ!

নিরুপায় পিতামাতাকে সমাজের নিন্দা-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য কুমারী স্নেহলতা যখন সেই পোড়া সমাজেরই নৃশংস পণ-প্রথার সমীপে আত্ম-বলিদান করিল তখন বিজ্ঞ-সামাজিকগণ শাসনদণ্ড লইয়া একেবারে খাড়া হইয়া উঠিলেন। ব্যক্তির এই উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের ভাল লাগিল না। কিন্তু হে জরাজীর্ণ, নিষ্ঠুর সমাজ, যে পাপ পদ্ধতির জন্য আজ এই স্নেহের পুতলীটি—বাপ মার কোল শূন্য করিয়া মরণের পথে চলিয়া গেল—সে নারকীয় প্রথা তুমিই না প্রচলিত রাখিয়াছ—কুমারীর প্রাণবলি পাইয়াও তো কই তোমার চৈতন্য হইল না!

তাই আজ বঙ্গের শত শত ঘর অন্ধকার করিয়া দলে দলে কুমারীগণ সমাজের এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে সব স্নেহের ডোর ছিন্ন করিয়া যমের কবলে অগ্রসর হইতেছে—তুমি শুধু বসিয়া নিন্দাই করিতেছ; সমালোচনাই করিতেছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহার প্রতিকার কিছু

করিয়াছ কি? যতদিন তাহা না করিবে এই নরমেধযজ্ঞ চলিতে থাকিবে—কেহ ঠেকাইতে পারিবে না, ঘরে বসিয়া তোমার চোখরাঙানির দিকে কেহ ভ্রূক্ষেপও করিবে না—কাজে কিছু না করিয়া সমালোচনা করিলে কি হইবে?

নিজের প্রাণটার শেষ নিজে করা যত সহজ মনে করা যায়, তত নয়। সংসারে অনাহারে, রোগে শোকে মানুষ নিয়ত কত কষ্টই তো পাইতেছে, মুখে কতবার মৃত্যু কামনা করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক মৃত্যুর ছায়া দেখিলেই—তখনই জীর্ণ প্রাণের শীর্ণ অবশেষটুকুকে কত আশাভরে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিতেছে যেন তাহাকে কোনোদিন মরিতে হইবে না! আজ যদি শাহাজানের মত কোনও সম্রাট আসিয়া বলেন "সংসারে কে আছ এস, তোমার জীয়ন্ত সমাধির উপর তাজ গেঁথে দেবো"—কয়জন অগ্রসর হইতে পারিবে, বল তো?

অশীতিপর বৃদ্ধার নয়নের মণি একমাত্র গুণবান পুত্র কথা কহিতে কহিতে মরিয়া গেল—কই সে তো প্রাণ বিসর্জ্জন করিল না! ষোড়শী যুবতীর জীবনের আশা আহ্লাদে আগুন দিয়া প্রাণাধিক পতি কোন্ অজানা দেশে প্রস্থান করিল—কই তাহার তো প্রাণ বাহির হইয়া গেল না! পিতা থাকিতে পুত্র মরিতেছে, বন্ধু থাকিতে বন্ধু যাইতেছে কিন্তু সংসারের এই নিষ্ঠুর মরণ-লীলার মাঝে কে কাহার সঙ্গী হইতেছে বল?

একটি বালকের সন্ন্যাসে মতি হয়—তাহাতে সকলে তাহাকে উপদেশ দেন "বাবা, সবই যদি সংসার ধর্ম্ম না ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে থাকে, তাহলে বিধাতার সৃষ্টিরক্ষা কিসে হবে বল?" বালক উত্তর করিল "সবাই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে এমন শুভ দিন যে আসবে না সে বিষয়ে সকলেই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন। তবে যদিই বা কোন দিন তাই হয়, তাহলে

যিনি এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা সৃষ্টি করেছেন, কোটি বিশ্বের প্রলয় স্থিতি যাঁর অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিরন্তর সংঘটিত হচ্ছে তিনিই তাঁর রচিত সৃষ্টির একটা কিছু উপায় করতে পারবেন, এ বিশ্বাসটুকু আমাদের থাকা উচিত।"

প্রাণ বিসর্জ্জন ব্যাপারেও তাই। অমুক এই অবস্থায় নিজের প্রাণটা শেষ করিয়াছে—তাহার সেই মরণের জন্য যদি সাধুবাদ করি, অমনি হাজার হাজার লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়া সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবে—এই ধারণা যাহার সামান্য একটু আছে, সে-ও পোষণ করিবে না। অপর একজনের উদ্দেশে প্রাণ দিতে পারে এমন হৃদয়ের যোগাযোগ সংসারে দুর্লভ—যদি একটি ঘটনা সেইরূপই হয়, তবে তাহা আমাদের স্বার্থ-নীচতা কলুষিত ধরাকে পবিত্র বই অপবিত্র করিবে না।

"বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,—
যাবার লাগি মন তারি উদাসে
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া;
পথে চলা সেইত তোমায় পাওয়া।"

পতির জন্য সতীর স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগের হেতু আদর্শ প্রেমিক ভিন্ন কে আর বুঝিবে? যাহার ব্যথা সেই জানে যে, তাহার ব্যথার ব্যথী সেও কতক জানে, যে গিয়াছে সে যে কত কষ্ট, কত বেদনা পাইয়া তবে নিজের এই অমূল্য জীবনটা হেলায় বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কে জানিবে?

সে মৃত্যুকে মৃত্যুহীনের অপরূপ সাজে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। শরীরের কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে, সংসারের মস্ত মস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা

তাহার কাছে তুচ্ছ বোধ হইয়াছে—স্বর্গীয় প্রেমের অমিয় মাধুরী তাহাকে মরণের দারুণ যন্ত্রণা ভুলাইয়া দিয়াছে। সে প্রবাসী পথিকের মত অনন্তের অনন্ত পথে যাত্রী হইয়া জীবন দেবতার উদ্দেশে নশ্বর দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—মরণের পরপারে অমর হইয়া সংসারের নীচতা, মলিনতা ভুলিয়া গিয়া সত্যশিব সুন্দরের রুদ্রলীলার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

"যে দিল ঝাঁপ ভবসাগর মাঝখানে
কূলের কথা ভাবে না সে,
চায় না কভু—তরীর আশে,
আপন সুখে সাঁতার কাটা সেই জানে
ভবসাগর মাঝখানে।
রক্ত যে তার মেতে ওঠে—মহাসাগর কল্লোলে
ওঠাপড়ার ছন্দে হৃদয়
ঢেউএর সাথে ঢেউ তোলে।
অরুণ আলোর আশিস্ লয়ে
অস্তরবির আদেশ বয়ে
আপন সুখে—যায় সে চলে কার পানে
ভবসাগর মাঝখানে।"

বাঙলা কাব্যে একটী নতুন সুর

যে নূতন কবির নূতন সুরের কথা আজ বলিব, তিনি অনেকের অপরিচিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। যতীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি শীঘ্রই পুস্তকাকারে "মরীচিকা" নাম দিয়া প্রকাশিত হইবে—আশা করি, তখন তাহার বিশেষ সুরটি সাধারণের নজরে পড়িবে। আমি শুধু তাঁহার "ঘুমের ঘোরে" নামক কবিতাগুলি হইতেই নূতন সুরটী কি তাহা দেখাইব। এই কবিতাগুলি পূর্ব্বে "যমুনা"য় প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণের দৃষ্টি যতটা আকর্ষণ করা উচিত তাহা করে নাই। যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায় প্রভৃতি কবিগণ কবিতাগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আমিও এগুলির ভিতর একটি নূতন সুরধ্বনি পাইয়াছি; কবিতার ভিতর দিয়া এমন একটা বিদ্রোহ ভাব বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই। কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় কাব্য-কালান্তক রস আবিষ্কার করিয়া "যমুনা"য় কিছু কাল আগে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। ইহাতে "নূতন কবিতা, পুরাতন কবিতা, ঘুষঘুষে কবিতা, প্রবল কম্প কবিতা, পালা কবিতা, বিষম কবিতা, ধোঁয়া ধোঁয়া কবিতা, ছোঁয়াচে কবিতা, একমাস অন্তর কবিতা, চাকরী চাপা কবিতা" প্রভৃতি যেরূপ কবিতা রোগই হউক না কেন, নিশ্চয় ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। "বুকজ্বালা, মন হুহুকরা, চোখে ঝাপসা দেখা, প্রাণ কেমন করা, রাত্রে নিদ্রা না আসা, পেট ফাঁপা, মাঝে মাঝে হাত শুড় শুড় করা, ইত্যাদি উপসর্গ এক বটিকা সেবনেই

উপশমিত হইবে। বিশেষ চেষ্টায় বেতস, বিছুটি প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি দেশীয় গাছগাছড়ায় এই মহৌষধ প্রস্তুত। পথ্যের কোন ধরাকাটা নাই। কেবল ঔষধ ব্যবহারের সময় ও পরেও একমাস জ্যোৎস্না লাগান, ফুল শোঁকা এবং মাসিকের সম্পাদকের সহিত পত্র বিণিময় নিষিদ্ধ।"

এ হেন কাব্যকালান্তক রসের আবিষ্কর্ত্তা যতীন্দ্রনাথের হাত হইতে কি করিয়া কবিতা বাহির হইল, ইহাতে অনেকের বিশেষ সন্দেহ হওয়ার কথা।

ওমর খৈয়ামের কবিতার সঙ্গে আমাদের কবির লেখার জায়গায় জায়গায় বেশ মিল আছে। "ওমরের কবিতায় কেহ কেহ কেবল মদিরার গন্ধ আর রূপসীর ঠোঁটের জিয়ান রসের স্বাদ পাইয়াছেন, কিন্তু ওমর খৈয়াম যেমন 'ব্রহ্ম মিথ্যা' কখনও বলেন নাই, তেমন শুধু নাচ, গান, পান করার তথ্য প্রচার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। যদি বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইত তাহা হইলে তাঁহার কবিতা ব্যর্থ ও নিকৃষ্টতর হইত। প্রকৃত পক্ষে এ কবিতাগুলি অভিমানের ও বিদ্রোহের কবিতা। কবি বলিতেছেন, "হে শাস্ত্রকার, তুমি আমাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারিবে না অথচ আমাকে শত সহস্র 'না'র মধ্যে জড়াইয়া আমার জীবনটাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে—তাহা হইবে না। আমি তোমার কথা মানিব না। হে আমার চিত্ত, তুমি কেন বৃথা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস পাইয়া কষ্ট পাইতেছ? এস বিশ্রাম কর। অর্থহীন তর্ক ছাড়িয়া দিয়া চল আমরা নিভৃতে গিয়া কোনও তরুণীর অধর সুধা পান করিয়া শ্রান্তি দূর করি।"

"কিন্তু ওমরের চিত্ত কি এই আহ্বান শুনিয়াছিল? ওমর কি

আপন ইন্দ্রিয়ের সেবায় মগ্ন হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বিস্মরণ হইয়াছিলেন? না, তাহা নহে। এ ক্ষণিকের বিদ্রোহের পরেই আবার মন সেই পুরাতন চিন্তা লইয়া ব্যস্ত হইত। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত তখন এক একবার হৃদয়ে বিরক্তির উদয় হইত এবং তখনই এই শ্রেণীর কবিতার জন্ম হইত।"

যতীন্দ্রনাথ ঘুমের ঘোরে অবসন্ন হইলেও ভগবান এবং সংসারটাকে একবারে সাদা চোখে দেখিয়া ফেলিয়াছেন এবং উপরের রংচঙে না ভুলিয়া ভিতরকার খড় বাঁশ টানিয়া বাহির করিয়াছেন। এই বাস্তবতার প্রতি ভক্তি এবং অবাস্তবতার উপর নিদারুণ বিদ্রোহ বাঙলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম ধ্বনিত করিয়াছেন।

আজকাল একটা ফ্যাসান হইয়াছে যে, কবিতার ভিতর কথায় কথায় ভগবানকে লইয়া টানা হ্যাঁচড়া করা। অসীম লইয়া সীমার ভিতর নাড়াচাড়া করা, দুঃখকে সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা, যন্ত্রণাকে দেবতার মঙ্গল দান বলিয়া লইতে বলা—ইহাই কবিদের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনে যিনি সত্যই ইহা অনুভব করেন, তিনি এরূপ কথা বলুন আপত্তি নাই, কিন্তু যার তার মুখে এসব কেবল কথার গাঁথুনি মাত্র বলিয়া বোধ হইবে—ভাবহীনের অসারতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। তাই যতীন্দ্রনাথ বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া বাস্তবকে বাস্তবের আকারে দেখিবার জন্য বলিলেন—

অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে;
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে।
দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল—ভাবি দেবতার দান,
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান!

উল্টো কথা

—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের সুর দিনে দিনে পড়ে চাপা।
কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা!
কোথা সে অগ্নিবাণী!
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্ত্তিখানি?
কালোকে দেখাবে কালো ক'রে আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো;
পুড়ে উড়ে যাবে বাজারের যত বর্ণ ফেরানো গুঁড়ো!
খেলোয়ারি প্যাঁচ দূরে গিয়ে কবে তীরের মতন কথা,
বর্ম্ম ভেদিয়া মর্ম্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্ম্মব্যথা।
এ কথা বুঝিবে কবে?
ধান ভানা ছাড়া কোন উঁচুমানে থাকে না ঢেঁকির রবে।

ইংরেজ কবি সুইনবার্ণের ভাবের সহিত দু এক জায়গায় আমাদের কবির ভাবের মিল আছে। ইবসেন, বার্ণার্ডশ প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকগণ সত্যের এই নগ্নমূর্ত্তি উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রিয়তম মৃত্যুশয্যায় কাতর—বহুদিন শুশ্রূষা করিতে করিতে নারীর দেহ মন প্রাণ অবসন্ন—এমন সময় প্রিয়তমের মৃত্যু হইলে শুশ্রূষাকারিণীর মনে প্রিয়তমের দুঃখ শান্তি হইল বলিয়া হয় ত যে একটু আনন্দ হয়; তাহার পিছনে নিজের ক্লেশের অবসাদ জনিত আনন্দ লুক্কায়িত থাকে কি না ইউরোপীয় কবি বুকে হাত দিয়া দেখিতে বলিতেছেন। বাস্তবিক কথাটার স্পষ্ট সত্য জবাব দেওয়ায় সাহসের দরকার বটে! আমাদের কবিও বলিতেছেন!—

মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।
প্রেম ও ধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন বলিনে আমি এ কথা,
মিথ্যা মাত্র বৃথা নহে যদি ঘুচে তাহে কারো ব্যথা।

আমাদের রোগ এই যে, কবিতা পাইলে তাহার এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খাড়া করিয়া থাকি। জীবনের ছোট বড় সকল ঘটনাতেই যেখানে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি কারণ না পাইয়া পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসে আমরা সেখানে সত্য মিথ্যা একটা উদ্দেশ্য দর্শাইয়া নিজের মনটাকে প্রবোধ দিই। ইহাতে মানসিক বলহীনতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই বলিয়াছেন যে, একজন স্পষ্টবাদী সরল নাস্তিককে তিনি একজন অবিশ্বাসসম্পন্ন আস্তিকের অপেক্ষা বেশী ধার্ম্মিক মনে করেন। গুঁতোর চোটে প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে—সংসারের ভাষায় যাহাকে দুঃখ কষ্ট বলে তাহা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতেছি, অথচ মুখে বলিতেছি—ওটা সুখেরই একটা রূপান্তর মাত্র, এবং ভগবানকে ইহার মঙ্গলময় দাতা বলিয়া অভিনন্দন করিতেছি।

তাই কবি বলিতেছেন—

আমরা যখন সুখে সুখী হই—সে নহে তোমার দান,
তোমার বিধানে নহে যে আমরা দুখে হই ম্রিয়মাণ,—
কেন যে এ সব আছে,
সে কৈফিয়ৎ তুমি কোনদিন দেবে না কাহারও কাছে।
সাগরের কূলে পুরী তব দারু মুরতি জগন্নাথ ;—
রথের চাকায় লোক পিষে যায় তোমার নাহিক হাত !

উল্টো কথা

তুমি শালগ্রাম শিলা ;—
শোওয়া বসা যার সকলি সমান তারে নিয়ে রাস-লীলা !

কবির বিদ্রোহ এইবার পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন, ভগবান যদি থাকেন তো তিনি সৃষ্টি করিয়াই খালাস—সৃষ্টির উপর আর তাঁহার কোনো হাত নাই। তাঁহার চন্দ্র তপন তারকা সকলই ঘড়ির মত চলিতেছে। "থাক্ বা না থাক্ স্রষ্টা—নিখিল বিশ্ব ঘুরে ঘুরে মরে তুমি তার চির দ্রষ্টা। আর জগৎটা—

চারি পাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া,
আলো আঁধারের গরাদে বসান অপার বিশ্ব-কারা।
এরি মাঝে ঘুরে তারকা তপন বহিয়া কাহার বোঝা !
এরি মাঝে উড়ে কোকিল, পাপিয়া, হাঁড়ি চাচা, কাদাখোঁচা।
পথ নাই পালাবার ;
উঠে, প'ড়ে, ছুটে, ঘুরে ঘুরে লুঠে, কেবল শ্রান্তি সার।
যুগ যুগান্ত ভ্রমণ-ক্লান্ত নিশ্চল কত গতি,
ফাঁকি খুজে কত মহাতপনের নিবিল আঁখির জ্যোতি।
তবু নাই কারো ছুটি,
অভ্যাস ঘোরে হাতড়িয়া মরে আঁধারেতে মাথা কুটি।
অসীমের কারাগার—
যত যেতে চাও তত যাও, শুধু বেড়ায় মিলে না পার।
এত বড় খাঁচা মুক্তির ধাঁচা বিদ্রূপ করো না ক'।
সীমা নাই যার, নাহিক দুয়ার, না বন্ধ নহে খোলা,
গাছে গাছে দাঁড় হাজার হাজার, দাঁড়ে দাঁড়ে দেওয়া ছোলা

এ ব্যঙ্গ কিসে সহি ?
কয়েদে যখন ব্যবস্থা কর কয়েদীর মত রহি।
বিদ্রোহী মন উপায় নাই, দেখিয়া বলিতেছে—
নচেৎ মুক্তি দাও
চারিদিকে এই অসীমের সীমা একবারে খুলে নাও।
জীবন মরণে কর্ম্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন কাটে না আমার দিন।
নাহি যবে প্রয়োজন,
আমার মাথায় আকাশের মেঘ করিবে না গরজন।
বুঝি প্রয়োজন বহিবে পবন, প্রয়োজনে ঝরে বৃষ্টি,
আপনারে ঘিরে প্রতি মুহূর্ত্তে গড়িব আপন সৃষ্টি।
যবে পুনঃ হবে সাধ,
প্রাণ ভ'রে কেঁদে ধুয়ে মুছে দেব নিজে গড়া অপরাধ।
যদি ভাল লাগে ভালবেসে তোমা ডাকিব বন্ধু ব'লে
সমানে সমানে ছলনাবিহীন দিন যাবে কুতূহলে।

মানবের স্বাধীন ইচ্ছা নাই—যদি চান ভগবান কোনোদিন Mr. Montaguর মত কাহাকেও পাঠাইয়া আমাদিগকে reforms দিতে চান তাহা হইলে কবি বর্ণিত এই democratic equality এবং free will আমরা চাহিব। আর এখন কি আছে—

বন্ধু গো আমি জানি হেথা চির ভোটহীন অধীনতা,
নিরুপায় হ'য়ে কেহ বলে তোমা পিতা, কেহ বলে মাতা।
আমি বলি, কিনে তুলো
পিঠে বেঁধে দাও গভীর নিদ্রা, দু'কাণে গুঁজিয়া তুলো।

উল্টো কথা

লাট্টুর সহিত একটি উপমা দিয়া কবি বুঝাইতেছেন যে, আমাদের জীবনে কি খেলা চলিতেছে তাহা আমরা জানি না—সেই খেয়ালী খেলোয়াড়ই জানেন। তাঁহার আনন্দ কিসে তাহা তিনি নিজেই বুঝেন, আমরা কেবল মিথ্যা একটা লক্ষ্য জীবনে আরোপ করিয়া নিজেরা ঘুরিয়া মরি।

ছেলেরা লাট্টু খেলে,
লেতিতে জড়ায়ে মুঠায় ঘুরায়ে বোঁও ক'রে ছুড়ে ফেলে
বন্ বন্ বন্ ঘুর ঘুর পাক চিতেন কেতেন সোজা ;
লাট্টু বলিছে "হায় হায় হায় ঘুরে ঘুরে কারে খোঁজা।
জীবন যে আসে ফুরায়ে।"
বলিতে বলিতে ফুরাল ঘুরণ—বালক লইল কুড়ায়ে।
আবার লেতিতে জড়ায়ে লাট্টু গপ্‌চা মারিয়া ফেলে,
একটার ঘাঁয়ে অন্যে ফাটায়ে ছেলেরা লাট্টু খেলে।
দেখিনু দাঁড়ায়ে কোণে,—
ফাটা লাট্টুটা ছুড়ে ফেলে দিল দূরে কণ্টক বনে।

এ স্থলে ওমরের নিম্নলিখিত লাইনগুলি তুলনা করা যাইতে পারে—

"নাইকো পাশার ইচ্ছা স্বাধীন যেই নিয়েছে খেলায় তার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেলছে তারে, যখন যেমন ইচ্ছা তার।
মানুষ নিয়ে ভাগ্য খেলায় করেন যিনি কিস্তিমাৎ—
সবটা জানেন তিনিই শুধু, জয় পরাজয় তাঁরই হাত।"

তাই জীবনের সুখ দুঃখের জন্য সে নিষ্ঠুরের কাছে হাত পাতিয়া কি হইবে—

আমি বেশ জানি সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটাই শ্লেষ
জোড় করি দুটি কর ;
মাগিব না আমি তুষ্টি তোমার যতই বহুক ঝড়।
আমাদের কাছে তুমিও যে কিছু চাহ না সে জানি আমি ;
আপন খেয়ালে ঢালিয়া বর্ষা আপনিই যাবে থামি।

জগতের এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে কবি এই মস্ত নিয়ম আবিষ্কার করিলেন—

একটি নিয়ম মান তুমি সেটি কোন নিয়ম না রাখা
আঁখি মুদে দেখি পাগলের মত ঘুরিছে কালের চাকা।

বলিলেন ইহকাল পরকাল লইয়াও মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—

পূর্ব্বকালে যা ছিনু আজ তার হয় না তো প্রয়োজন,
পরকালেতেও যা'হবে তা'হবে, কেন বৃথা আয়োজন।

যে ভগবান ক্ষুধা দিয়া অন্ন দিয়াছেন আবার জন্ম দিয়া মৃত্যু দিয়াছেন—তাঁহার দান অদান সবই সমান। এ যেন গোরু মেরে জুতা দান।

গোরু পোষাণির প্রায়—

জননীর কোলে ছেলে বড় কোরে কে পুনঃ কাড়িছে হায় !
ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক,
দেঁতো হেসে বলে ইচ্ছাময়েরি ইচ্ছা পূর্ণ হোক ;

অন্য অর্থটি—

যাহার পাঁটা সে যেদিকে কাটুক তাহে অপরের কি ?

জগতে কত অবতার আসিলেন, কত নূতন নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত

হইল, কিন্তু জগৎ যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিল—জীবের দুঃখের ভার আর কমিল না—

ঈশা, মূশা আর বুদ্ধ
কণফুসিয়স মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই শুদ্ধ,
সবাই বলেছে পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান ;
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর তোমাদেরি তিনি চান।
উপায় পেয়েছি মুখ্য,—
রবে না নরের জরাব্যাধি শোক পাপতাপ আদি দুঃখ।
যেমন জগৎ তেমনি রহিল নড়িল না একচুল,
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল !
কি হবে কথার ছলে ?
ভগবান চান—তবু হয় না'ক একথা পাগলে বলে !

এই সব দেখিয়া শুনিয়া কবি শিখিলেন—

চারি দিক দেখে চারি দিকে ঠেকে বুঝিয়াছি আমি তাই,
নাকে শাঁক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।
যদি বল তুমি সুখ দুঃখ নাই দু'টাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশানো ক্রম।
জারি কর তবে খ্যাতি,
এ ভব রোগের নব চিকিৎসা আমার "ঘুমিওপ্যাথি।"

হানিমানের হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের পর বিংশশতাব্দীতে কবিবর "ঘুমিওপ্যাথি" আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে সংসারের অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার লাভের জন্য উহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বড় দুঃখেই পরামর্শ দিলেন। দেখিলেন, "এজগৎ মাঝে সেই তত সুখী যার গায়ে যত ঘাঁটা," এ সুখ দুঃখের কার্য্য কারণ জন্মান্তরের রহস্যের

ভিতর তিনি পাইলেন না। জগৎটা একটা হেঁয়ালি বলিয়া তাঁহার নিকট বোধ হইল—"যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খামখেয়ালি।" বিশ্বস্রষ্টাকে স্তব স্তুতি করা ভুল—যা হবার তা হবেই। "মোরা ভুল ক'রে প্রণমি তোমায় ভুল ক'রে করি রোষ। তোমার তাহাতে নাহি আনন্দ নাহিক অসন্তোষ। আমরা তোমায় ডাকি,—যন্ত্রণা পাই সান্ত্বনা চাই—আপনারে দিই ফাঁকি।"

দার্শনিকের ন্যায় কবি Personal God অস্বীকার করিলেন। তাঁহার ঈশ্বর যেন বেদান্তের নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম। জগৎরহস্য বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, অনিয়মটা সকলের চেয়ে জগতেরই বড় নিয়ম—

জগতের শৃঙ্খলা
স্বপ্নেরি মত উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা
বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।

এতটা শ্লেষ করিয়াও কবি ক্ষান্ত নহেন—মানবের প্রেম নশ্বর এবং তাহা যে বারোটার বেশী রাত জাগিলেই অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহাও বলিলেন—অবশেষে "কোন্ অধিকারে আমারে সৃষ্টি করিলে জগন্নাথ"—এতখানি প্রশ্নও করিয়া বসিলেন! মানুষের দর্শন সত্যই ইহার সন্তোষজনক উত্তর আজও দিতে পারে নাই। কবির এই বিদ্রোহ ভাবের পরিচয় পাঠক পাইলেন। ইহার মূল বেদান্তের ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু তিনি ঢেঁকির শব্দে ধান ভানা ছাড়া আর কোনও মানে যে নাই—তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন। এখন আমরা সংসারটাকে সেই ভাবে দেখিতে পারিব কি?

বারীন্দ্রের দ্বীপান্তরের বাঁশী

কবি যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় যাহাকে স্থখসন্ন্যাস" এবং "গেরুয়ার বিলাসিতা" বলিয়াছেন, বারীন্দ্রের কবিতার ভিতর সে ভাবের গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া কারাগারে জীবন্ত সমাধি অবস্থায় লিখিত এই কবিতাগুলি বাঙ্‌লা সাহিত্যকে এক নূতন সম্পদ দান করিয়াছে এবং বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ভাব-সম্পদ এবং রসের গভীরতার জন্য এইগুলিকে আদরে বরণ করিয়াছেন।

বারীন্দ্রের কবিতা অবসর কাল কাটাইবার জন্য intellectual luxury নয়। মর্ম্ম নিঙারিয়া হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভূতির রক্তলেখা দিয়া এই কবিতাগুলি জন্মলাভ করিয়াছে। ব্রাহ্ম ধরণের বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের আজ কালকার সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়—এমন কি, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির নকল রাজসংস্করণও মেলে। কিন্তু সে সকল কবিতার পিছনে প্রাণ নাই—প্রাণের আবেগ-ভরা উচ্ছ্বাসময় অনুভূতি নাই। প্রেমের ঠাকুর চণ্ডীদাস অলঙ্কারহীন ছন্দে যে মরমের কথাগুলি গাহিয়া গিয়াছেন—তাহা বাঙালীর নিজস্ব প্রাণের কথা। তিনি সত্য সত্যই 'কাম গন্ধ নাহি তায়' এমন প্রেম রামী রজকিনীর সহিত উপভোগ করিয়া গিয়াছেন এবং লৌকিক লাজ মান ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া প্রিয়তমাকে নিজের আরাধ্য জ্ঞানে যে গীতি-পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন তাঁহাকে সকল কালের সকল প্রেমিকজনের পূজনীয় করিয়া রাখিবে।

বারীন্দ্রের দ্বীপান্তরের বাঁশী

সংসারে সকল রস সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া প্রাণটা কি একটা মহারসের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। নিজের মানস-দেবতাকে পাইতে গিয়া মানব বন্ধু, স্ত্রী, পুত্রকন্যা, আত্মীয় স্বজন, স্বদেশবাসী, সমগ্র মানব-জাতি এমন কি সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিকে পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে আশ্রয় করে এবং সকলের প্রেমে সেই প্রেমময়ের টান অনুভব করিয়া থাকে এবং যতদিন না, সেই প্রেমের পূর্ণ উপলব্ধি ঘটে ততদিন তাহার এই সকল ছোট ছোট প্রেম সার্থকতা লাভ করে না। খণ্ড খণ্ডভাবে ইহাদিগকে লাভ করিয়া তাহার মন তৃপ্তি পাইতে চায় না এবং না-পাওয়ায় অতৃপ্তিতে সময় সময় বিদ্রোহী হইয়া হারানোর অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া অবসাদগ্রস্ত হয়। বারীন্দ্রের প্রেম সংসারের সাধারণ পথে প্রবাহিত হইতে না পাইয়া রুদ্ধ অবস্থায় জমাট বাঁধিয়া একেবারে চরম প্রেমে পরিণত হইয়াছে। অন্য কাহারও প্রাণ হইলে ইহা নিঃশেষ লাভ করিত, কিন্তু অত বড় প্রাণ বলিয়াই বারীন্দ্রের সে শক্তি একেবারে 'নিরাকারা তবু নিখিল-আকারা' সেই বঁধুয়ার প্রেমের উপলব্ধি করণে সমর্থ হইয়াছে।

সে অখণ্ড প্রেমে মরণ নাই—সমস্ত সৃষ্টির রহস্যটাই তাহার সহিত জড়িত রহিয়াছে—'এ যে সৃষ্টি বসনে আবরি দু'জনে দু'আঁখি গো এক করা'—এ প্রেমের মিলনের শুভদৃষ্টি এইরূপ—এ প্রেমের চুম্বন-মধু হইতেই সৃষ্টির সৃষ্টি—আর প্রলয়. সে তো এই প্রেমিক যুগলের আঁখি-লোর—মরণের চোখ-বোঁজা, সে-তো বঁধুর সহিত লুকোচুরি খেলায় চোখ টিপে-টিপে ধরা! প্রেম-কল্পনার এমন বিরাটত্ব সাহিত্যে অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না!

প্রথমে প্রাণের ঈপ্সিতম, প্রিয়তমকে পাইবার একটা আকুল

আকাঙ্ক্ষা—তারপর সেই 'পিয়া'কে পাওয়া—সে পাওয়াতে কত সুখ, নববধূটির মত পিয়ার কোলে শুইয়া প্রেমের স্বপনে বিভোর হওয়া—জগতের আর সব মিলনকে প্রাণ-ভরা নয় বলা—তারপর অনিচ্ছায় সংসার মাঝে উঠিয়া আসা—সেখানে আসিয়াও সকল রসের ভিতর দিয়া পিয়া অনুভব—কখনও নারী, কখনও পুরুষরূপে পিয়া সুখসম্ভোগ—এমন কি শেষে ভেদ ঘুচিয়া 'সোঽহং' ভাবের উদয়—এই রূপহীন প্রেমলীলার পশ্চাতে অনুভূতি না থাকিলে শুধু আর্টের দ্বারা ইহাকে কথার গাঁথুনিতে সাজাইয়া তোলা সম্ভবপর নয়। ইহার পিছনে বাস্তব জীবনের অনুভূতি রহিয়াছে।

বর্ষার ঘোর দুর্দ্দিনে কংসের অন্ধকার কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলাভ হইয়াছিল—বারীন্দ্রের আরাধনার ধন বংশীবদনের জন্মও সুদূর আন্দামানের নির্জ্জন কারাকক্ষেই হইয়াছিল। সাগর-মেখলা, বনানি-কুন্তলা আন্দামানের কারাগৃহে স্বাধীনতা-মন্ত্রের উদ্বোধক যে গীত গাহিয়াছেন, তাহার কোমল-মধুরধ্বনি আজ চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে।

যে মহাপ্রাণ জীবনের সুখ দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া ভয়হীন মরণের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন—তাঁহার প্রাণের জ্বালাময়ী গৈরিক স্রাব আজ যে তটবিপ্লাবিনী কলরব-মুখরা স্রোতস্বিনীর ন্যায় বঙ্গের শ্যামল অঙ্গ শোভা করিয়া বহিয়া চলিয়াছে—ইহা বড়ই নয়ন-মনোরম দৃশ্য! এতখানি স্বদেশ-প্রেম, নিঃস্বার্থ কর্ম্মের দুর্দ্দান্ত বাসনা যাহা সহস্র মানবের হৃদয়ে অগ্নি সঞ্চার করিয়াছে, নির্জ্জন কারাকক্ষে সেই ভাবের জ্যোৎস্নাশীতল কানু-প্রেমে পরিণতি বাঙালীর বড়ই আদরের সামগ্রী

হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণের পর সমগ্র হৃদয় দিয়া এমন প্রেমানুভূতি বাঙলা দেশের সাহিত্যে বোধ হয় আর ফুটিয়া উঠে নাই।

জনমে জনমে যুগে যুগে যিনি কত ভঙ্গে, কত রঙ্গে হৃদকমলে লীলা করিতেছেন—সেই জীবন-দেবতাকে সেই প্রেমরসরূপকে, সেই কানুকে না পাইয়া কবি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন—

"প্রতি অঙ্গ মোর কানু ক্ষুধাতুর
সে কানু কেন রে দূর এতদূর?"
"সখি আমারে শিখায়ে দে!
সেই যে তেয়াগে সব পাইবার
সুখ উপজিবে রে।
মনটি দিবে সে কোন্ প্রেম ভিখে
কাঙ্গাল সাজাইয়ে?"
"ওরে দে মোরে দেখায়ে দেঁ!
হেরি যা' নয়ন জনমেরি শোধ
আর না ফিরিবে রে;—
সারাটা জীবন একটী দিঠিতে
কুড়ায়ে লইবে সে।"

সে কানুকে কেন চাই? তাই কবি উত্তর দিতেছেন—

"বিষয়ে বিষয়ে বঁধু
আছ ওগো মধু হয়ে,
কামনা-পাগল আমি
তাই তো জগৎ লয়ে।
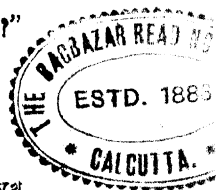
তুমি ভোগরূপী নাথ
    কেন হলে সুখসার ?
তাই পাপ লালসায়
    করিনু তো কণ্ঠহার।
দরশের কান্তি মোর
    পরশের কোমলতা,
ঐহিক বাঞ্ছিত ওগো
    ইন্দ্রিয়ের সফলতা।
এতরূপ ধরেছ যে
    তাই সঙ্গ কাঙ্গালিনী
হয়েছি তোমারি লাগি
    আমি বার-বিলাসিনী।"

রুচি-বাগীশ মহাশয় হয়তো এই পরি-কল্পনায় নাক শিট্‌কাইবেন —কিন্তু সাধক যিনি, প্রেমিক যিনি, জগতের নানা গন্ধে, নানা বর্ণে, নানা ছন্দে সেই পরম পুরুষের লীলারস আস্বাদন করেন, তাঁহার মূক হৃদয়ই এই ভাবের মর্ম্ম গ্রহণে সক্ষম হইবে। কৃষ্ণ-রাধা নাম শুনিলেই যাঁহাদের গায়ে জ্বর আসে, অথচ পাশবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় যাঁহাদের সমস্ত জীবন কাটিয়া যায়—তাঁহারা এই মহাভাবের অর্থ গ্রহণে সমর্থ হইবেন না।

"নিরাকারা তবু নিখিল আকারা
বড় রূপসী গো বঁধু সে আমার।"

কবি এইবার সেই অরূপ রূপসীকে পাইয়াছেন, তাই আনন্দে সেই প্রেম-সুন্দরকে অভিনন্দন করিতেছেন—

"কে এল মোর
হৃদয় আঙ্গিনায়
প্রেমনীরে অন্ধ নয়ন
মরম গলে যায়।"

বঁধুর সঙ্গে এইবার কত সোহাগ, কত আদর, কত চুম্বন উপভোগ করিতেছেন—কিন্তু সবই অনির্ব্বচনীয়ের অব্যক্ত ভাবে। এই অরূপ রতন বুকে ধরিয়া রূপে বিভোর কবি চমৎকৃত হইয়া বলিতেছেন,

"কি লাবনী ধাম মরি
তাহে কবির স্বপন গেছে হারি
সে যে সীমার মাঝে অসীম রাজে
দিগ্‌বলয়ে গগনপারা।"

বঁধুর সহিত পৃথক থাকিয়া করি সম্ভোগ সুখ উপভোগ করিতে চান—তাই ভেদেই তাঁহার আনন্দ—

"আপনা হারায়ে
পিয়াময় হয়ে
নাহি বুঝি এত সুখ
ধরি আন কায়া
নূতন করিয়া
যত লো চুমিতে মুখ।"

এই মিলন সুখের সময় যে অনুভূতি তাহা কি অনুপম—

"কে বলিবে একি বিজলি শিহরি
পরাণ পরশি যায়!

জগত জুড়ান শান্তি অমিয়া
মরমে নিঙাড়ি দেয়!"

ইহার তুলনায় জগতের অন্যের সুখ কিছুই নয়, তাই আবার বলিতেছেন—

"তোদের যত জানাজানি যতরে মিলন
তাহে প্রেম আশা ভরে কি এমন?"

সে প্রেমের লাস্য লীলা কতই বিচিত্র—জীবন মরণের সব রহস্য জড়ানো সে লীলা কত ভাবেই চলিতেছে—মরণে যে চোখ বোঁজা সে যে বঁধুর চোখ টিপে ধরা বই আর কিছুই নয়—

"কাঁদাবার সুখে এতই পীড়ন
এত জ্বালাতন করা,
পীড়ার তাড়সে চিতার হুতাশে
চোখ টিপে টিপে ধরা।

*   *   *   *

স্বরগ মরত ভরিয়া মোদের
প্রেমের পড়েছে সাড়া
এ যে সৃষ্টি বসনে আবরি দু'জনে
দু'আঁখি গো এক করা।"

যে প্রেমিক যুগলের বিবাহ-মিলনের শুভদৃষ্টি এই—তাহাদের ভালবাসার উপমা কবি দিলেন—

"কাল সেথা ওগো বঁধুর সোহাগ
দেশ তার প্রেমকোর

স্বষ্টি মোদের চুম্বন মধু
প্রলয় আঁখির লোর।”

প্রেমের এই গভীর বিরাটত্বে ডুবিয়া কে সেই মিলন সুখ ছাড়িয়া আবার সংসার মাঝে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে—কিন্তু স্বপনের মাঝে জাগরণ আসিয়াছে—

হে আমার মায়া যাদুকর!
মজাইতে অবলায়
কেন গো জাগালে তায়?
সহজে পাগল দাসী, অসহ সুন্দর—
তুমি যে তাহার সুখ কলঙ্কের ডর।
তবু বুকে ঘুমাবার সাধ
মেটেনি এখনও আজি
লাজ মান ভয় ত্যজি
ছিনু শুয়ে, সুখে মোর কে সাধিল বাদ?
একাকারে চিনি ঘুম সুধার আস্বাদ।

কিন্তু জাগরণের মাঝেও সংসারে ফিরিয়া কবির আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে—তাই

“ধরা পড়া ভালবাসিরে!
মধু গন্ধে মোরে সে নেছে ডাকিয়া
বাঁধিতে বুকের দলগুলি দিয়া
প্রেম প্রতারণে
সুরভি মরণে
তাই এ জগ-কুসুমে পশিরে।”

জগতে আসিয়া তখন আর ভেদজ্ঞান থাকিল না—সকল সৃষ্টির ভিতর দিয়া কবি সেই স্বপনবিহারীকে পাইলেন—

"কোন্‌টি যে মায়া আহা কোন্‌টি যে তুমি!
স্বপনেরি মাঝে বঁধু
স্বপন রচেছ শুধু
কত মুখ তুয়া জ্ঞানে ফেলিনু যে চুমি।"

রূপে যে সাধ মিটে নাই—প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া নিবৃত্তিতে তাহাকে পাইয়া কবি এক মহা একত্বের অনুভূতি সুখে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"আঁখি মুদিয়া যে সাধ মিটেছে
রূপে মিটেছিল কই?"

আবার অবাক হইয়া বলিতেছেন—

"কেন আপন অঙ্গ চুমিয়া মরি
নাথ বলি নিজ চরণে ধরি!"

তখন অসীমের একত্বে সব এক হইয়া গিয়াছে—সাধকের চরম অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিয়াছে—

"বঁধু নাই তবু দেখ
এত ভালবাসি!
মোর আখি দু'টি রয়
নিতি মোরই প্রতীক্ষায়!
ওগো নিজপদে বিনামূল্যে
বিকায়েছে দাসী।"

ভাগবতের গোপীগণের অনুভূত এই ভাব আমরা বাঙলার প্রেম অবতার শ্রীচৈতন্যের নিকটেও পাইয়াছিলাম—

"মুঞি সেই মুঞি সেই
কহি কহি হাসে।"

আবার রসের ঠাকুর বিদ্যাপতিও তাই বলিলেন—

"মাধব মাধব করি সোঙরিতে
সুন্দরী ভেল মাধাই।"

রসের কবি জয়দেবের ভিতরও এই ভাব পাই—

"মুহুরবলোকিত-মণ্ডন-লীলা
মধুরিপুরহম্ ইতি ভাবন-শীলা।

আমাদের জাতীয় জীবনের সাধনার ভিত্তি—আমাদের প্রেমিক সাধকগণের তপস্যার ধন—এই মহাভাবের লাভ আমরা বারীন্দ্রের সাধনাতেও পাইলাম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন দুঃখিনী বঙ্গভূমির সাধনক্ষেত্র চিরদিনই এমন উর্ব্বর করিয়া রাখেন।

———
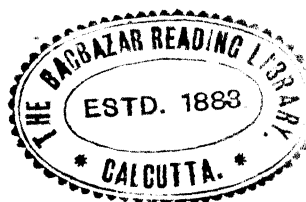
সৌন্দর্য্য ও প্রয়োজন

শাহজাহান তাজমহল না গাঁথিয়া যদি গোটাকতক ধর্ম্মশালা তৈরি করিয়া যাইতেন—তাহা হইলে হয়তো মানুষের কাজে লাগিত। লোকজন আসিয়া তাহাতে বিশ্রাম করিত, খাওয়া-দাওয়া করিত, বিদেশে আশ্রয় পাইয়া কতকটা উপকৃত হইত! আর তাজমহলে রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাওয়ার কথা তো দূরে থাক, একটা গোরু বাঁধিয়া রাখিবার খোঁটা পর্য্যন্ত নাই! প্রকাণ্ড সুন্দর বাড়ীটা পড়িয়া আছে—এক পয়সা ভাড়াও আসে না! এইরূপ দোকানদারি বুদ্ধিতেই সংসারের বেশীর ভাগ লোক হিসাব করে। এমন যে সুন্দর ঐ তরুণী, যাহার অরুণিম অধরে যেন সুধা ক্ষরিতেছে, মুখ দিয়া বচন-অমিয়া ঝরিতেছে, ভ্রমরের মত কালো চোখ দুটির উজ্জল তারা প্রাণের নীরব আবেশ যেন বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে, কালো এলোচুল গোলাপী রঙের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া, প্রশস্ত ললাটখানিতে অলস অলকার ঢেউ তুলিয়া কত শোভার সৃষ্টি করিয়াছে, সংসারের মুদিভায়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মূল্য ঠিক করিলেন—তেইশ টাকা দশ আনা। মানুষের ভিতর যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বণ আছে—তাহার দাম নাকি অত! অবশ্য আমি যুদ্ধের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি—এখন হয়তো মানুষের মূল্য কিছু বাড়িয়া থাকিতে পারে!

জগৎকে দেখা, তাহার সৌন্দর্যকে দেখা এবং মানুষের সৃষ্ট সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করার একটা ধরণ আছে। যে স্বভাবেই সুন্দর, অথবা মানুষের হাতে গড়িয়া সুন্দর—তাহাকে শুধু আমার প্রয়োজনীয়তার দিক

দিয়া দেখিলেই চলিবে না! প্রকৃতির আনন্দ—তাহার সৌন্দর্য্য নিজের ভাবেই, নিজের নিষ্প্রয়োজনীয় ভাবেই অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়া আছে। এই যে মাথার উপরে অসীম নীলের বিস্তার, সেই নীলের মখমলে গ্রহ-তপন-তারকা-চন্দ্রের যুগ যুগ ধরিয়া নটনলীলা; ঐ যে অভ্রভেদী গিরিশিখর, অনন্ত বিস্তৃত নীলজলধি, উহা কি প্রয়োজনে লাগিতেছে জানি না। ঐ নীলকে ধরিয়া যদি আমার রঙের কারখানা চলিত, কিম্বা হিমালয়ের সাদা বরফ আমার দোকানে মণ হিসাবে বিক্রয় হইত, নীলাম্বুধির জলরাশি সেঁচিয়া লবণ বাহির করিয়া ব্যবসা চালানো যাইত—তাহা হইলেই কি ঐ সকল সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের বিশ্বে সার্থকতা ঘটিত?

কালো মেঘের কোলে চপলার ঐ যে উদ্দাম হাসি, পাহাড়ের পাদদেশে ফুলের ঐ যে ঠেলাঠেলি, স্রোতস্বিনীর পাশে ঐ যে সবুজের মনোরম বিস্তার—উহার সার্থকতা কি কেবল মানুষের প্রয়োজনেই? নখর লোহিত ঐ যে গায়ে ছিটে-ফোঁটা হরিণ শিশুটি মায়ের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, কোমল তৃণের আগাটি ভাঙিয়া খাইতেও যাহার কষ্ট বোধ হইতেছে, যাহার প্রাণ-কেড়ে নেওয়া চাহনিতে কি একটা করুণ-সুন্দর রস ঢালিয়া দিতেছে ওর দিকে চাহিয়া সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইব, না উহার মাংস কয় সের হইবে, তাহা ভাবিয়াই জিহ্বা হইতে প্রেমাশ্রু নিঃসরণ করিব?

সুন্দরকে নিষ্প্রয়োজনের ভিতর দিয়াই দেখিব। আমাদের জীবনে সেই নিষ্প্রয়োজনীয়তা মস্ত বড় একটা প্রয়োজনরূপে আছে। ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিই—তাহাতে কাজ হয় না বটে, কিন্তু দিনের বেলায় যে কাজটুকু করি, তাহা ঐ অকাজের সময়টুকুতে বিশ্রাম পাই বলিয়া। মানুষ শুধুই রক্তমাংস, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন নয়—২৩॥৵০ অপেক্ষা

তাহার মূল্য অনেক বেশী। যে রাসায়নিক এই অপূর্ব্ব মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন—তাঁহার সুন্দর শিশুটিকে লইয়া আমি যদি ২৩৷৵০ দিই, তিনি খুসী হইবেন কি? অথবা তাহাকে মারিয়া যদি ঐ মূল্যের একখানি চেক দিই—তাহা হইলেই তাঁহার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে কি? কিম্বা প্রিয়তমের মৃত্যু হইলে সান্ত্বনা দিতে গিয়া যদি ঐ টাকা তাঁহার হাতে দিয়া প্রবোধ দিই—শোকের দারুণ জ্বালা নিবিয়া যাইবে কি?

তা যখন হয় না, তখন মানুষের দাম অন্যপ্রকারে কষিতে হইবে। তাহার ভিতর নিষ্প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষই তখন জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া দেখিতে পাইব। সৌন্দর্য্য অনুভব এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ভিতর প্রয়োজনের কথা নাই। নিষ্প্রয়োজনেই তাহার চরম সার্থকতা। হিসাব বুদ্ধির নিকট যাহা নিষ্প্রয়োজন—প্রয়োজনাতীত এমন একটা স্থান মানুষের জীবনে আছে, যেখানে নিষ্প্রয়োজনটাই মস্ত বড় একটা প্রয়োজন।

ঊষা তাহার সোণার আঁচল উড়াইয়া আসে—পাখী গায়, মানুষ অভিভূত হয়। শিশু তাহার আধ-আধ ভাষায় কথা বলে, কচি ঠোঁটে মিঠে হাসি হাসে—মানুষের মন তাহাতে গলিয়া যায়। যুবতীর অঙ্গলাবণ্য ঢল ঢল করিয়া প্লাবিয়া বহিয়া যায়—মানব সে প্লাবনে ভাসিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে। বসন্তের আগমনে নবকিশলয়ে সাজিয়া বৃক্ষলতা সূর্য্যকিরণে ঝলমল করে—কবির মন সে রূপে রসে ভরিয়া উঠে। অসীম সৌন্দর্য্যের নিকেতন এই বিশ্বজগৎ মানুষকে পাগল করিয়া রখিয়াছে। চিত্রে, কাব্যে, ভাস্কর্য্যে মানুষের সেই পাগলামি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির হাসিরাশি, হৃদয়ের প্রেমোচ্ছাস, অন্তরের নিভৃত অনুভূতি

মানবের সৌন্দর্য্য বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া—তাহাকে উদাস করিয়া, পাগল করিয়া, প্রয়োজনের পারে লইয়া গিয়া আর্টের সৃষ্টিতে নিযুক্ত করিয়াছে। তাই ধর্ম্মশালা না হইয়া তাজমহলের সৃষ্টি হইয়াছে—তাই কবি বলিয়াছেন—

একথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর সা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবনযৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

বাঙালীর আর্য্যামি

গোঁড়ামিতে রবীন্দ্রনাথের গোরাকে পারিয়া উঠিবার জো নাই। সে নিজেকে পরম হিন্দু মনে করিয়া ফোঁটা তিলক ধারণ করিয়া হিন্দুয়ানীর মূর্ত্তিমান প্রতিনিধি স্বরূপ সর্ব্বত্র হিন্দুত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বেড়াইত। কিন্তু জানিত না, যে সে খৃষ্টান আইরিশম্যানের সন্তান—ঘটনাচক্রে হিন্দুর ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের বাঙালী জাতিটিও ঠিক সেইরূপ। আর্য্যামিতে বাঙালীকে পারিয়া উঠিবার জো নাই। সে নিজেকে পরম আর্য্য মনে করিয়া সর্ব্বত্র আর্য্যামির দোহাই দিয়া নিজের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু গোরা যে পরিমাণ হিন্দু, বাঙালীও সেই পরিমাণ আর্য্য।

আমাদের দেশে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।

অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—"বাঙালী জাতিটা যে একটা মিশ্র অনার্য্যজাতি—মোঙ্গোল কোল মোখ্মের দ্রাবিড় এই সব মিলে সৃষ্ট খিচুড়ী, যাতে আর্য্যত্বের গরম-মশলাটুকু উপরে পড়েছে মাত্র; এ কথাটা স্বীকার করতে যেন কেমন লাগে। বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ বৈশ্য কায়স্থ নাকি শতকরা ১৩ জন মাত্র; যাঁরা ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতির, তাঁহাদের মধ্যে দু'চার জন বড় গলায় "বাঙালী অনার্য্য" এ কথাটা বলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় তাঁরা মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে, তাঁরা ব্রাহ্মণ অতএব আর্য্যত্বের গরম মশলার একটা কণা, অনার্য্য

চাল ডাল ন'ন। আমি নিজে ব্রাহ্মণবংশীয় ; কিন্তু আমার বিশ্বাস গরম মশলাটুকুতেও ভেজাল আছে।"

বাঙালীকে অন্-আর্য্য * বলিলে হয়তো বাংলার আর্য্যগণ মারিতে উদ্যত হইবেন। "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—এটা বিজ্ঞানের বেলায় খাটাইলে চলিবে না। তাই সত্যের খাতিরে গোটাকতক অপ্রিয় কথার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে করিতেছি। গালাগালির পুষ্প-চন্দন বর্ষিত হউক—কিন্তু আমার কথাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা হইলেই ধন্য হইব। অবশ্য ইহার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি অনেক থাকিতে পারে—দেখাইয়া দিলে কৃতজ্ঞতার সহিত নতমস্তকে মানিয়া লইব।

আমাদের মোটামুটি বক্তব্য এই—

(১) আর্য্যামির বড়াই করিলেও জাতি এবং ভাষা হিসাবে গোড়ায় আমরা আর্য্য নই।

(২) মূলে অনার্য্য বলিয়া আমাদের লজ্জিত হওয়ার কোনো আবশ্যকতা নাই ;—কারণ ৫।৭ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা হইলেও, অনার্য্য সভ্যতা নিতান্ত কম দরের ছিল না ; আর্য্যসভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার আগেই তাহা যথেষ্ট কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিল এবং পরে আর্য্য সভ্যতাকেও বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

জাতি হিসাবে আমরা কি, নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে দ্রাবিড়ী-মোঙ্গোলীয় বলিয়াই আমরা একরূপ সাব্যস্ত হইয়াছি।* রিজলী (Herbert Risley) সাহেব এই সব

* অনার্য্য "শব্দটির সঙ্গে একটা বদ্‌গন্ধ জড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক সুনীতিবাবুর পদানুসরণে শব্দটি এইভাবে লিখিলাম। আর্য্যদের না হইলেই যে জিনিষটা খারাপ হইবে, এইরূপ ধারণা মূলেই পরিহার করিতে হইবে।

আলোচনা করিয়া আমাদের কাছে যথেষ্ট অপ্রিয় হইয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস বিষয়ক অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইংরেজী গ্রন্থে জাতিবিষয়ে আমাদের স্বরূপ নিঃসন্দেহে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভূতত্ত্ব এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক নূতন জিনিষ বাহির করিতেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আলোচনা আমাদের দেশে আরম্ভ হয় নাই। মাত্র অধ্যাপক পঞ্চানন মিত্র মহাশয় এদিকে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একখণ্ড প্রস্তরে লিখিত কতকগুলি চিহ্নের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন—তাহাতে "মাঅতো" গোচের একটা কথার সন্ধান পাইয়াছেন। ইহার অর্থ মানুষ বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিতেছেন। এই সকল যথার্থ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে এদেশে অক্ষরের প্রচলন ছিল, তাহা প্রমাণিত হইবে। অক্ষরের সৃষ্টি কত সময়-এবং সভ্যতা সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমেয়।

ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন, বহু পূর্ব্বকালেই বঙ্গীয় সভ্যতা বৃহত্তর ভারতে (Further India) প্রচারিত হইয়াছিল।

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
"একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।
"সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
"তুই তো না মা গো তাদের জননী
তুইতো না মা গো তাদের দেশ।"

ইহা শুধু কবিকল্পনা নয়; ইহার মূলে সুদূর অতীতগামী ঐতিহাসিক

সত্য নিহিত রহিয়াছে। বিজয় সেনানী যখন হেলায় লঙ্কা জয় করেন তখনও বাঙলা দেশ আর্য্য সভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে।

"পাণ্ডব-বর্জ্জিত" এই দেশ কি সেকালে কি একালে বরাবরই বাংলার বাহিরের লোকের দ্বারা ঘৃণিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীনতর ও নিম্নস্তরের সভ্যতার ধারা বজায় রাখিলেও অথর্ব্ববেদ বেদ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে যেমন অনেক দেরী লাগিয়াছিল এবং ত্রয়ীবিদ্যাই আজও যেমন তাহাকে কোণ-ঠেসা করিয়া রাখিয়াছে, সেইরূপ আমরা আর্য্যত্বের দাবী করিলেও, বাহিরের লোকে আমাদের সে দাবী অস্বীকার করিয়া আমাদিগকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিমে ব্রাহ্মণেরা আমাদের বাড়ী ভাত রাঁধিতে আসিয়াও আমাদের ছোঁয়া হাঁড়ীতে খাইতে চায় না। অনার্য্যের আড্ডা দক্ষিণ ভারতেও বাঙালী ব্রাহ্মণের স্থান তফাতে।

পশ্চিমের কায়স্থের পৈতা আছে—এদেশে নাই। এদেশের কায়স্থগণ শূদ্র বলিয়াই পরিচিত। তবে তাঁহাদের অনেকে বড় লোক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ মস্তকে হস্তামর্ষণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদিগকে "সৎশূদ্র" উপাধি দিয়াছিলেন। "দেব-বর্ম্মা"ই হই, আর "দেবী" উপাধিই লিখি "দাস" নাম কায়স্থের ঘুচিল না। পৈতা নিলেও সে ব্রাহ্মণের চোখে দাস এবং সৎশূদ্রই আছে। এই গেল কায়স্থের কথা। বাঙলা দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বলিয়া দ্বিতীয় তৃতীয় বর্ণের জাতি নাই। কায়স্থেরা মসিজীবী ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিলেও তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের অনেক দেরী আছে। তাঁহাদের মত মালো, গোয়ালা প্রভৃতি জাতিও সমানভাবেই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন। তার পর ব্রাহ্মণগণের কথা। আদিশূরের পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনার গল্প

যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পাঁচজন ব্রাহ্মণী আনার কোনো উল্লেখ পাই কি? বাঙলার ব্রাহ্মণের আদিমাতা কে? ইহার জবাব কে দিবে?

মুষ্টিমেয় কয়েক লক্ষ ব্রাহ্মণ কায়স্থের কুলজী তো এই; বাকী সকলের অনার্য্যত্ব সম্বন্ধে তো কোনো গোলযোগই নাই! যে দেশে শতকরা ছাপ্পান্ন জন অস্পৃশ্য জাতির লোক, সেখানে সংখ্যার অনুপাতেও আর্য্যের স্থান নাই। বাংলা দেশে যদি কেহ আর্য্য থাকেন তবে তাঁহারা যেন গাঁ শুদ্ধ লোককে একঘরে করিয়া বসিয়া আছেন।

যাহাদের লইয়া বাস্তবিক দেশ, বহু শতাব্দীর সহস্র সামাজিক বন্ধনের সাহায্যে এবং বুদ্ধিবৃত্তির বলে তাহাদিগকেই আমাদের তথাকথিত আর্য্যগণ চাপিয়া রাখিয়াছেন। সুখের বিষয়, আজ জগতের চারিদিক ওলটপালট করিয়া সে অন্যায় অত্যাচারের মৃত্যু ঘোষিত হইয়াছে।

জগতে আর্য্য বলিয়া যাঁহারা আপনাদিগের পরিচয় দেন, তাঁহাদের সকলেরই মাথায় আবরণ একটা কিছু আছে, কিন্তু আমাদের আর্য্যত্বের সে নিদর্শন কোথায় উড়িয়া গেল? আমাদের অপেক্ষা আরো গরমদেশে তো মাথায় আবরণ এখনো ব্যবহৃত হইতেছে। দৈহিক গঠন, বেশভূষা এবং আচার পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি করিলেই আমাদের আর্য্যত্ব সম্বন্ধে বেশ একটু সন্দেহ আসিয়া পড়িবে। বাঙ্গালীর অহঙ্কার আছে যে, বুদ্ধিমত্তায় সে সকলকে ছাড়াইয়া যায় এবং তাহার মত ভাবপ্রবণতাও কম জাতির আছে। এ কথার সত্যতা আছে, কিন্তু এই দুইটি Characteristics বা বিশিষ্ট গুণ সে কোথা হইতে পাইল? ভারতে এক মারাঠি ছাড়া অন্য কোনো জাতি চতুরতায় বাঙ্গালীর সমতুল্য নয় বলিয়া আমার ধারণা। কিন্তু দুইটি জাতিই বোধ হয় বহুল পরিমাণে অনার্য্য রক্তের মিশ্রণের ফলে এইরূপ হইয়াছে; ইহাই ত বোধ হয়। তারপর আর্য্যগণ

বিজয়ীর জাতি—দেশ জয় করিতে করিতে দুন্দুভি দামামা লইয়া রুধির-রঞ্জিত পথেই তাহারা অগ্রসর হইয়াছে। এ জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ অশ্বমেধ। রাণী কৌশল্যা ঘোড়া কাটিয়া পুত্রার্থে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন।

"পশূনাং ত্রিশতং তত্র যূপেষু নিয়তং তদা।
অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ॥
কৌশল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা॥"
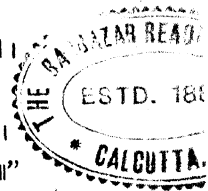
কোমল তৃণভোজী ছাগশিশু বলিদানেই যাহার বীরত্বের অবসান সেই ভাবপ্রবণ জাতির মা কস্মিন্ কালেও কৌশল্যা নয়।

"ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া এইটুকু বলা যায়, বেদের সময় হইতেই আর্য্য ভাষা অনার্য্যের ঘরে জাত দিয়েছে, তাকে আর কিছুতেই ঠেলে শুদ্ধ করে জাতে তোলা যায় না। একদিকে বেদের আর প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ভাষা—আর এক দিকে বাঙলা প্রভৃতি; এদের যদি দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যায়, দেখা যায় যে. তামিল তেলুগুর যে ছাঁচ, বাংলারও সেই ছাঁচ; যদিও বাংলার ধাতুগুলি আর শব্দগুলি মুখ্যতঃ তদ্ভব, অর্থাৎ বৈদিক থেকে উৎপন্ন। বৈদিক ক্রমে প্রাকৃত হল, প্রাকৃত বাঙলা প্রভৃতিতে দাঁড়াল। এই পরিবর্ত্তন কিন্তু একটানা ভাবে হয় নি। বাঙলা প্রভৃতির উৎপত্তি আর প্রকৃতি বিচার করলে এইটুকু বোঝা যায় যে, বৈদিক কালের 'জাত' আর্য্যভাষীর বংশধরের মুখে মুখে বদলে এলে যে রকমটি এর রূপ দাঁড়াত, এর এখনকার রূপটি সে রকম নয়। আর্য্যভাষা অনার্য্যভাষীর দ্বারা গৃহীত হওয়াতেই এর পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক হয় নি। আমরা আর্য্যভাষা বলি কিন্তু ঠিক প্রাচীন আর্য্য

ধরণে আমরা ভাবি না, আমরা ভাবি দ্রাবিড় ভাবে।" এই হইল অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা।

গোরাকে দেখিয়া যেমন বুঝিবার জো নাই যে সে অহিন্দু—আবার মজা এই যে, সে জানিত না যে সে অহিন্দু—আমাদের জাতিটিকেও সেইরূপ বাহির হইতে বুঝিবার জো নাই যে, তিনি অন্‌আর্য্য এবং তিনি জানেনও না যে তিনি অন্‌আর্য্য।

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের স্থান

পাশ্চাত্যের অঙ্গুলি হেলনে আজ জগৎ চালিত। আমাদের চেয়ে তাহারা যে অনেক বিষয়ে ঢের অগ্রসর—তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে আজ এই মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় এত বড় জগৎটার উপর এমনভাবে প্রভুত্ব করিতে পারিত না। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহারা কি অদ্ভুত উন্নতিলাভ করিয়াছে—তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

অবশ্য এই যুদ্ধ ব্যাপারটা দেখিয়া তাহাদিগকে অসভ্য মনে করিলে চলিবে না। প্রাচীন ভারতেও 'সূচ্যগ্র মেদিনী'র জন্য অনেক কুরুক্ষেত্র হইয়া গিয়াছে। তাই বলিয়া ভারত তখন অসভ্য ছিল—একথা বলা যায় কি? যুদ্ধবিগ্রহের মোটামুটি ফল কি—মানব কোন কালে ইহার আয়োজন ব্যতীত চলিতে পারিবে কি না—তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। সুতরাং এইটিকে মাপকাটি করিয়া সভ্যতার উন্নতির বিচার করা সঙ্গত হইবে না।

প্রাচীন ভারত সেকালকার অন্যান্য দেশের অপেক্ষা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চ্চাতেও যে বহু পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ছিল—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের দর্শনশাস্ত্র আজিও জগতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিতে হইবে না যে, ভারতের চেয়ে আর কোন জাতি অপরাপর বিষয়ে অধিক উন্নত হইতে পারে নাই।

স্বদেশ-প্রেমিক ভারতের প্রতি ধূলিকণার ভিতর দেশের অতীত এবং ভবিষ্যৎ গৌরব-গাথা লুক্কায়িত দেখিবেন—তাঁহার নিকট ভারতের

প্রতি নদ, প্রতি জনপদ মহাতীর্থ বলিয়া বোধ হইবে—স্বদেশের বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মরে, নির্ঝরের ঝর্ঝরে স্বর্গগীত প্রতিধ্বনিত হইবে—তিনি 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' এমন একটি রাজ্য মাঝে নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলিবেন—যাহার অতীতের গৌরব তাঁহার হৃদয়ে নিত্য আশার বারিসেচন করিবে, আর তিনি সেই অফুরন্ত আশায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া স্বদেশের মহত্তর ভবিষ্যৎ সংগঠনে প্রয়াসী হইবেন।

কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি আমাদিগকে আফিমের নেশার মত পাইয়া না বসে। উহা যেন আমাদিগকে বর্ত্তমানে কর্ম্মবিমুখ না করিয়া দেয়।

অতীত ভারতের জীর্ণাবশেষের উপর মহত্তর নূতন ভারত গঠিত করিতে হইলে একদিকে যেমন জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেম চাই—অন্যদিকে তেমন দেশের গায়ে কোথায় কি ক্ষত আছে, সে সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই। দেশের প্রতি ভালবাসা আমাদিগকে অনেক সময় অন্ধ করিয়া দেয়। এই অন্ধতা অবশ্য ভালবাসার জগতের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সেজন্য স্বদেশ-প্রেমিককে বিশেষ সাবধান হইয়া কাজ করিতে হইবে। দেশের দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ না রাখিলে, মায়ের গাত্রক্ষত আরোগ্যলাভ করিবে না এবং সেবকের প্রাণ দিয়া ভালবাসা কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতায় পর্য্যবসিত হইয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার স্থায়ী মন্দির নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে না।

প্রাচীন গৌরব-গাথার সার্থকতা এই যে, তাহা যেন আমাদের প্রাণে এই বিশ্বাসটা দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেয় যে "আমরা স্বপ্নবিলাসীদের বংশধর নহি; আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে যেমন সাধক, সিদ্ধ ও অগ্রসর ছিলেন, তেমনি কর্ম্মীও ছিলেন, এবং বৈজ্ঞানিক

বিষয়ের সাধনাতেও সিদ্ধ ছিলেন। ভাল ক'রে নিদ্রা দেওয়ার জন্য প্রাণে এই বিশ্বাস আনতে চাই না, কাজ করার জন্য এই বিশ্বাস চাই।"

আমাদের সব ভাল, আর পাশ্চাত্যের সকলই মন্দ—এরূপ ধারণা থাকা অন্যায়। জগতের সকল সভ্যতাই ভালমন্দমিশ্রিত এবং পরস্পরের কোন না কোন প্রকার আদান-প্রদানে গঠিত। তবে প্রত্যেক সভ্যতারই এক একটা ধারা থাকে এবং তদুপযোগী আদর্শ থাকে। কোন্ সভ্যতার আদর্শ বড়, কাহার ছোট, এ কথা বিচার করা বড় শক্ত। পাশ্চাত্যগণ ভাবে তাহাদের আদর্শ বড়—প্রাচ্যগণ ভাবে আমাদের আদর্শ বড়। তাহারা মস্তিষ্কশূন্য আর আমরাই বুদ্ধিমান্, এমন কথাও বলা যায় না। জগতের কোনও সভ্যতাই যে ব্যর্থ-সভ্যতা নয় এ কথা অস্বীকার করাও চলে না। প্রত্যেক সভ্যতাই কমবেশী কিছু না কিছু সমগ্র মানবের বৃহত্তর সভ্যতার ভাণ্ডারে দিয়া চলিয়া যায়। মানবের চরম আদর্শ কি, যদি কোনও দিন অবিসংবাদিতরূপে এই সত্য নির্দ্ধারিত হয় তবেই এই সকল সভ্যতার আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু সে আশা বর্ত্তমানে দুরাশামাত্র।

আমি যেমন আমার সভ্যতাকে ভাল বলিতে পারি আর একজন পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তিও সেইরূপ নিজের সভ্যতাকে ভাল বলিতে পারে। এ বিষয়ে তাহারও যেমন অধিকার—আমারও তেমনি অধিকার। অবশ্য গায়ের জোরে নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে—লগুড় আমাদের বিপক্ষেই রায় দিবে, কারণ আমরা বক্তৃতাতে না হইলেও শরীরে দুর্ব্বল!

তবে ভারতবাসীর পক্ষে ভারতীয় সভ্যতার অনুগমন করাই ভাল।

তাহাতে জীবনের অভিব্যক্তি অধিকতর সুন্দররূপে হয়—কারণ জাতীয় সভ্যতাই মানুষের জীবনকে ভালভাবে ফুটাইয়া তোলে।

কিন্তু সভ্যতা তো একটা স্থির নিশ্চল প্রাণহীন পদার্থ নয়! তারও একটা জীবন আছে এবং সে জীবনের একটা ক্রমিক অভিব্যক্তি আছে—অন্ততঃ যতদিন সে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা রাখে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া চলিতে না পারিলে, সে সভ্যতা দিন দিন মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। এজন্য বিনিময় দরকার। তাই বলি, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বাদ দিলে বা ঘৃণা করিলে চলিবে না। নিজের সভ্যতার প্রধান ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাহির হইতে অনেক জিনিস আহরণ করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম আলোকে উদ্বোধিত হইয়া নব্যভারত একবারে তাহার হীন অনুকরণে ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছিল। আবার বর্ত্তমানে অনেকের মধ্যে একটা ভাব দেখা যাইতেছে—সেটি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তুচ্ছ করা এবং যে কোন প্রকারে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। যেমন, যদি কেহ বলে যে পাশ্চাত্যের অপূর্ব্ব সাধনা মানুষকে আকাশেও আধিপত্য দিয়াছে; অমনি আর একজন বলিয়া উঠিবেন—"ওরা আর কি করেছে—সে কালে আমাদের রামচন্দ্রও পুষ্পকরথে চ'ড়ে সিংহল থেকে অযোধ্যায় ফিরেছিলেন।" ইত্যাদি।

এ বিষয়ে দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামমোহন লাইব্রেরীতে আচার্য্য বসুর সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে তিনি বলেন—"শ্রোতৃবর্গ যেন কল্পনা না করেন, এই সকল (শাস্ত্রোক্ত) উক্তি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা আবিষ্ক্রিয়ায় সমান। তাঁহার মতে শাস্ত্রোক্ত এই সকল উক্তি পর্য্যবেক্ষণ ও একাগ্র চিন্তাপ্রসূত অনুমান মাত্র।

ইহার এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান অতি গভীর ও অতি বিস্তৃত।”

Spencer যাকে bias of patriotism বলিয়াছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটুকু থাকিলে চলিবে না। সেখানে যে শ্রেষ্ঠ, তাহার নিকট মাথা নত করিতেই হইবে এবং নিজে যতদিন না শিক্ষকের চেয়ে উন্নত হইতেছি—ততদিন বিনীতভাবে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া দিন দিন উন্নতি লাভের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

ভারতের সাধারণ ভাষা

বর্ত্তমানে ভারতের সাধারণ ভাষা কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছে। কথাটা সম্বন্ধে পণ্ডিত ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মত লওয়া উচিত। যার-যা-খুসী বলিলে চলিবে না। এইরূপ একটী সাধারণ ভাষা প্রকৃতই হওয়া দরকার কিনা এবং দরকার হইলে কোন্ ভাষা তাহা হইতে পারে—ইহা বেশ ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

ভারতবর্ষে ছোট বড় ১৪০টী ভাষা আছে। এত বড় একটা বিচিত্রতা-ময় দেশে এক ভাষার আধিপত্য সম্ভবপর নয়। রাজকার্য্য পরিচালন অথবা জ্ঞানের আদান-প্রদানের জন্য একটী সাধারণ ভাষা দরকার হইতে পারে। আগে ফারসী ও সংস্কৃত যথাক্রমে সেই কাজ করিত, বর্ত্তমানে ইংরেজী উভয়ের স্থানই অধিকার করিয়াছে। রাজ্য যখন আমাদের নয় তখন রাজ-কার্য্যের কথা ভাবিবারই আবশ্যক আপাততঃ নাই—মাথা থাকিলে ত মাথাব্যথা হইবে! তবে আমাদের বে-সরকারী একটা রাজনীতি আলোচনার ক্ষেত্র আছে—সেটা হইতেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসে কি ভাষা ব্যবহার করা উচিত তাহা পরে আলোচিত হইবে।

সাধারণতঃ তিনটী কারণে কোনো বিশিষ্ট ভাষার বহুবিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে—ধর্ম্ম, ব্যবসায় বা রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অথবা জ্ঞান প্রচারের বাহন রূপে ভাষার বিস্তার ঘটিয়া থাকে। আসিরীয়, গ্রীক্, লাতিন, আরবী প্রভৃতি ভাষা এইরূপে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। আমাদের রাজ্য বিস্তারের কোন কথাই নাই। ধর্ম্মবিস্তারও আমাদের দ্বারা

হইতেছে না, ব্যবসায় উপলক্ষে ভারতের বাহিরে যাওয়া এখনো আমাদের ঘটিয়া উঠে নাই। জ্ঞান প্রচারের জন্য আমরা ইংরেজীকেই অবলম্বন করিয়াছি।

এখন ভারতের ভিতরকার কথাই ধরা যাক্। এ স্থলেও রাজ্য বিস্তারের কোনো কথা নাই। ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে এক প্রদেশের অধিবাসী অন্য প্রদেশে গিয়া তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্ম উড়িষ্যা, মণিপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচারিত হইয়া বঙ্গভাষার বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে। ব্যবসায় উপলক্ষে এবং সাহেবদের অনুগ্রহে হিন্দুস্থানী আজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক এক ভাষা বলে। উত্তর ভারতে সকলেই এক ভাষা বলে—এইরূপ ধারণা অনেকের আছে। ইহা কিন্তু ভুল। পূরবী হিন্দী ও পশ্চিমে হিন্দীতে অনেক তফাৎ। বাঙ্গলা এবং উড়িয়ার ভিতরেও অতটা ভেদ আছে কি না সন্দেহ। এক জাতীয় হিন্দীতে কথা বলে এমন লোকের সংখ্যা বাঙ্গলাভাষাভাষিগণের সংখ্যা অপেক্ষা কম। সাহিত্য হিসাবেও বাঙ্গলা শ্রেষ্ঠ—Culture হিসাবেও বাঙ্গলা ভারতে অগ্রবর্ত্তী। কিন্তু তবুও বাঙ্গালীর ভাষা দেশের বাহিরে প্রসার লাভ করে নাই কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। ঘর ছাড়িয়া বাঙ্গালী শীঘ্র বাহির হইতে চায় না—ব্যবসায়বাণিজ্য বাঙ্গালী ভুলিতে বসিয়াছে। শিক্ষা বা রাজকার্য্য উপলক্ষে যে সকল বাঙ্গালী বিদেশে যায় তাহারা সাহেবী চালেই থাকে এবং ইংরেজীতে কিম্বা সেই দেশের ভাষাতেই নিজের কাজ চালাইয়া দিয়া থাকে। পরের ভাষা শিখিবার ক্ষমতা বাঙ্গালীর খুবই আছে।

উল্টো কথা

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর হইতে দুই চারি জন বিদেশী বাঙ্গলা ভাষা শিখিতেছে কিন্তু বাঙ্গলা ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও বিদেশীর শিক্ষার উপযোগী করিতে হইলে ইহাকে আরো সহজ করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু তাহার জন্য বর্ণমালা ও বানান সংস্কার আগে দরকার।

বাঙ্গলা ভাষা ভারতের Lingua Franca হইতে পারে কি না, এ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ মৌলভী মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে শান্তিনিকেতনে পাঠ করেন। সভায় ডাঃ তারাপুরওয়ালা, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ও বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক উপস্থিত ছিলেন। মৌলভী সাহেব বলেন,—ইংরেজী, উর্দ্দু ও হিন্দীর পর আবশ্যক সংস্কার করিলে বাঙ্গলাকে ভারতের সাধারণ ভাষায় পরিণত করা যাইতে পারে। ডাঃ তারাপুরওয়ালা বাঙ্গলার এরূপ কোনো আশা আছে মনে করেন না। তিনি হিন্দী ছাড়া আর কোনও ভাষায় আমাদের Lingua Franca হইবার সম্ভাবনা দেখেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, রাজনীতির ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য স্থলে আমাদের সাধারণ ভাষা যে ইংরেজী হইবে ইহা এক প্রকার ঠিক হইয়া গিয়াছে। রাজধানীতি ক্ষেত্রেও এতদিন ইংরেজী চলিতেছিল,—কিন্তু এখন একটা কথা উঠিয়াছে, ভারতীয় কোন ভাষা চালাইতে পারা যায় কি না এবং এই উপলক্ষে হিন্দীর নাম উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের কথা ধরিলে তিনি ইংরেজী অপেক্ষা হিন্দীতে যে কোনও সুবিধা হইবে তাহা মনে করেন না।

যাহা হউক, লেখকের মতে বাহিরের জগতের সঙ্গে আদান-প্রদানের জন্য ইংরেজী ভাষা চাই-ই। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে যোগ আমাদের

জাতীয় জীবনের অন্যতম সম্পদ। ইংরেজীর মধ্য দিয়া আমরা জগতের সমস্ত জাতির ভাবের সহিত যোগ রাখিতে পারিতেছি। আমাদের জাতীয় মহাসমিতির কার্য্য ইংরাজিতে হওয়াই ভাল। কারণ, ইহা দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমবায়—উচ্চাঙ্গের রাজনীতি প্রভৃতি চর্চ্চাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে যাঁহারা যোগ দেন, তাঁহাদের সকলেরই অন্ততঃ ইংরেজী জানা উচিত।

জনকয়েক কৃষক প্রতিনিধি (Peasant delegate) ধরিয়া আনিয়া সভার বিচিত্রতা উৎপাদন করা যাইতে পারে,—কিন্তু কংগ্রেসের মত সভায় ঐ ধরণের লোকের বিশেষ কাজ নাই। প্রাদেশিক সমিতি এবং জেলা সমিতিতে সকল শ্রেণীর লোক উপস্থিত হইতে পারেন এবং সেখানে দেশীয় ভাষার আলোচনা হওয়াই মঙ্গলজনক এবং না হইলে অন্যায় হইবে। অবশ্য প্রত্যেক উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর উচিত দাক্ষিণাত্যের একটী ভাষা ও অন্ততঃ হিন্দী ভাষাটা আয়ত্ত করা। বহু দিন হইতেই উত্তর ভারতে ভারতের রাজধানী ছিল। মুসলমান সম্রাটগণও ঐ দেশের ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্‌ভিন্ন ব্যবসায় প্রভৃতি নানা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্থানী বিদেশে যাইতে কুণ্ঠিত হয় না। তাহাদের প্রভাবেও হিন্দী ভাষা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তা ছাড়া হিন্দী সহজেই আয়ত্ত হয় বলিয়া এবং ব্যবসার ভাষা বলিয়া সাহেবরা এই ভাষা শিক্ষা করে। এমন কি, বাঙ্গালী আমরা চটিয়া গেলে হয় ইংরেজী না হয় হিন্দুস্থানী বলিয়া ফেলি। ভাষাটার কেমন একটা জোর আছে। উচ্চ সাহিত্য-বিজ্ঞান বা রাজনীতি চর্চ্চার উপযোগী শব্দ-সম্পদ না থাকিলেও কথাবার্ত্তার ভাষারূপে হিন্দুস্থানী বেশ উপযোগী। দাক্ষিণাত্যের হিন্দী অপেক্ষা ইংরেজীর বেশী চলন হইলেও সহরে অনেকে হিন্দী

বোঝে দেখিয়াছি। এ ছাড়া নানা রকমের হিন্দী ভাষা-ভাষীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এই সব কারণে মনে হয়, যদি কোন দিন কোন ভাষা ভারতের সাধারণ ভাষারূপে পরিগণিত হয়; তবে হিন্দীর সম্ভাবনাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

মহাত্মা গান্ধী বলেন, ভারতের Lingua Franca এমন হওয়া চাই, যাহার দ্বারা নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত্ত পূরণ হইতে পারে ;—

(১) রাজপুরুষগণ যেন তাহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন।

(২) জনসাধারণ যেন তাহা দ্বারা ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে পরস্পরের মনোভাব সহজে আদান প্রদান করিতে পারে।

(৩) অধিকাংশ লোক যেন সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

(৪) ঐ ভাষা কেবল সাময়িক প্রয়োজন সাধনের জন্য অস্থায়ীভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া যেন বিবেচিত না হয়।

মাহাত্মাজীর মতে, একমাত্র হিন্দী ভাষা এই কয়টী শর্ত্তপূরণে সক্ষম। তিনি ইংরেজী ভাষার বিরোধী নহেন তবে মনে করেন, কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ইংরেজীর সাহায্যে অর্জ্জিত হইতে পারে। হিন্দী বলিতে তিনি লক্ষ্ণৌয়ের ফারসী-মিশ্রিত ভাষা বলেন না ; ইহা ঠিক সংস্কৃত নয়, আরবী নয়, ফারসীও নয়, কিন্তু জনসাধারণের ভাষা। উহার এক বিচিত্র সৌন্দর্য্য আছে। এই ভাষাই সাধারণ ভাষা হওয়ার যোগ্য।

বিশ্বের দরবারে ভারত

চৌরঙ্গীর তেলা রাস্তায় যখন চাকার ক্যাঁচকুঁচ শব্দ করিতে করিতে মন্থরগতি গোরুর গাড়ী আষ্টে-পৃষ্টে বোঝা বহিয়া যায় আর তাহার পাশ দিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া মোটর ছুটে এবং টং টং করিতে করিতে ইলেক্ট্রিক ট্রাম বাতাসের মত চলে—তখন সে চিত্র দেখিয়া বিশ্বের মাঝে ভারতের স্থানের কথা মনে পড়ে। যুগযুগান্তর চলিয়া গেল, কত রাজ্য, রাজধানী কালস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল, কিন্তু গোরুর গাড়ী তাহার সেই শাশ্বত কালজয়ী কাটামোখানা লইয়া সমান ভাবেই বোঝা বহিয়া চলিয়াছে। কলিকাতার মত প্রকাণ্ড সহরে এত ব্যস্ততা, এত ক্ষিপ্রতার মাঝেও সে লোপ পায় নাই—তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই। এত সুস্তায় এমন বোঝা বহিতে কে পারিবে? না খাইয়া নামমাত্র পারিশ্রমিকে কে বিদেশীর বাণিজ্য গুদাম খোলসা করিবে? তাই গো-যান কলিকাতায় আছে—এবং সম্মানের সহিতই আছে কারণ আর সব গাড়ী চাপা দিলে চালকের জরিমানা হয়, কিন্তু গোরুর গাড়ীর বেলায় যে চাপা পড়িবে তাহাকেই জরিমানা দিতে হয়!

আমরা Foot ball of modern civilisation—বর্ত্তমান সভ্যতার ফুটবল এ কথাটা ঠিক। কানাডা হইতে মারিল লাথি, অষ্ট্রেলিয়ার আসিয়া পড়িলাম, অষ্ট্রেলিয়া হইতে লাথি খাইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌছিলাম; দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে এক স্যুটে একেবারে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। আমরা Citizens of the British Empire (ব্রিটিশ

রাজ্যের পৌরজন)—তাই আমরা শ্বেতাঙ্গের সহিত একত্র রণক্ষেত্রে মরিতে পাই, জাহাজের খালাসী হইয়া বাণিজ্য চালাই—বাগানের কুলী হইয়া সাম্রাজ্যের ধন সম্পদ বাড়াই! আমাদের প্রতিনিধি League of Nationsএ বসেন, জগতের শান্তি-স্থাপন-বৈঠকে যোগ দেন, শেখানো বুলিটী আওড়াইয়া তোতা পাখীকেও লজ্জিত করিয়া তিনি আমাদের মুখ রক্ষা করেন। বিশ্বের দরবারে আমাদের কতই না সম্মান!

কবি বলিয়াছেন—"এ মহাদেশের প্রতি তৃণ পরে আছে বিধাতার করুণ দৃষ্টি, এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি।" স্বর্গের অপ্রত্যক্ষ বিধাতার দৃষ্টি কোথায় আছে জানি না, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ ভাগ্যবিধাতার দৃষ্টি এ মহাদেশের প্রতি তৃণ পরেই আছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবগণ কি ভাবে পুষ্পবৃষ্টি করেন ঠিক ধারণা নাই, তবে আমাদের আরাধনার ধন গৌরাঙ্গ প্রভুগণ কি ভাবে আমাদের উপর পুষ্প চন্দন বর্ষণ করেন, তাহা কেরাণীর জাতি আমরা সকলেই জানি।

"ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা এসিয়ার তুমি তীর্থ-ক্ষেত্র"।

এই কি সেই ভারত! যে ভারতের তপোলব্ধ প্রথম জ্ঞান-কিরণ-পাতে এসিয়া-ভূমি চক্ষু মেলিয়াছিল, জগৎ বিস্ময়ে অবাক হইয়া চাহিয়াছিল, যেখানকার প্রেমের বার্ত্তা, জ্ঞানের বার্ত্তা বহিয়া অযুত সেনানী দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিত, অধ্যাত্মরাজ্য বিস্তারেই যেখানকার সম্রাটের বিপুল শক্তি ব্যয়িত হইত—আজ সেই ভারতের বিশ্বের দরবারে স্থান কোথায়? "ছিল রাজ্যেশ্বরী বীর-কেশরী প্রতাপ জননী রে"—এখন "পরপদাঘাতে দলিতা লাঞ্ছিতা দীনা কাঙালিনী সে।"

ভারতের এই অবস্থাতেও পরিতৃপ্ত হন—এমন ভারত-সন্তান এখনো আছেন। সকল শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের বুদ্ধিটা এমনই আচ্ছন্ন হইয়াছে, যে, ভারতের এই মরণ আমরা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেছি। জনৈক শিক্ষিত বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, যে, জগতের মাঝে ভারতবর্ষ যীশুখৃষ্টের ন্যায় মরিয়া, জগতের অত্যাচার সহিয়া, জগৎকে এক নবজীবন দিয়া যাইতেছে। কি চমৎকার কবিত্বময় ব্যাখ্যা !! "যামিনী না যেতে জাগালে না কেন, বেলা হ'ল মরি লাজে" অর্থাৎ "হে ভগবান নিদ্রিত আমাকে তুমি জীবন প্রভাত হইতে-না-হইতে কেন জাগালে না—এখন বয়সের বেলা হইয়া গেল, তাই সে লাজে মরিতেছে"—এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও ঠিক একই প্রকারের।

বোঝার ভারে পিঠ ভাঙ্গিয়া গেল—আর তো চলিতে পারি না। বিনা পয়সায় পাওয়া যায় এমন যে খাদ্য—যাহা জীবনে একবার খাইলে আর খাইতে হয় না—সেই মরণকালের খাবি খাইতে খাইতেও আমাদের কবিত্ব ঘুচিল না। জীবন-মৃত্যুর রূপক দিয়া তখনও আমাদের মরণ-পথের যাত্রাটার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতেছে—"চলিয়াছি জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া তোমার বোঝা বহিয়া তোমার দিকে, আসিতেছ কত জন্ম কত মৃত্যুর উপর দিয়া বোঝা নামাইতে আমার দিকে, চলিতে চলিতে খসিতেছে জীবনের পর জীবন বন্ধ ; জানু নত হইতেছে তোমার আসার পথে চাহিয়া বারবার, দুই আঁখি ঝরিতেছে কত না বিরহে যুগযুগান্তে।" এই আধ্যাত্মিকতার কথা শুনিতে বেশ, পড়িতে বেশ। কিন্তু খরগোসের মত চোখ দুটি বুঁজিয়া থাকিলেই ব্যাধ তো আর ধরিতে পারিবে না! এই মোহ না ঘুচিলে আমাদের মরণপথের যাত্রা অগস্ত্য-যাত্রায় পরিণত হইবে।

উল্টো কথা

কোথায় গেল আসিরিয়া, ক্যালডিয়া, ব্যাবিলন, মিসর, গ্রীস, রোম—কালের করাল কবলে একে একে সকলেই নিপতিত! কিন্তু ভারত আজও বাঁচিয়া আছে—আজিও ভরদ্বাজ, কশ্যপের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার লোক ভারতে আছে। তাই এ জাতি বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। উপযুক্ত চিকিৎসক চাই। ধাত ছাড়িয়া গিয়াছিল—আবার যখন নাড়ী ফিরিয়াছে, তখন আশা আছে। মৃতসঞ্জীবনী প্রয়োগ করিলেই প্রাণ আবার সতেজ হইয়া উঠিবে। বিশ্বের চারিদিকে সকল কর্ম্মের মাঝে, প্রাণের প্রেরণায় সে সঞ্জীবনী মিশাইয়া আছে। ভারতের প্রাণ তাহার সহিত যোগ করিয়া দাও, সে আবার নূতন আবেগে স্পন্দিত হইবে, শুষ্ক তরু আবার মুঞ্জরিবে, মরা গাঙে আবার বাণ আসিবে—কেবল চাই এখন এমন একদল অকূলবিহারী নেয়ে যাহারা, জয় মা বলিয়া এই জোয়ারে তরী ভাসাইয়া দিবে, অকূলেও কূল পাইবে।

বিশ্বের দরবারে সবাই আসিল—আমরাও না গিয়াছি এমন নয়। ইংরেজী বাজনার দলে জয়ঢাক ঘাড়ে করিয়া গিয়াছি—আমাদের পিঠে ঐ বৃহৎ যন্ত্রটাকে রাখিয়া ইংরেজ বাজাইয়াছে—আমরা কুঁজো পিঠে ঘাড় হেঁট করিয়া বহিয়াই চলিয়াছি—সে যাওয়া তো আমাদের সার্থক যাওয়া হয় নাই। জগতের ধর্ম্মসভায় বিবেকানন্দ গিয়া কি এক নূতন সাড়াই দিয়াছিলেন, বিশ্বকবি সভায় রবীন্দ্রনাথ এক নূতন তন্ত্রী বাজাইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক মহলে রামানুজম্‌, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র এত নূতন সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন, ঋষি অরবিন্দের প্রাণের প্রফুল্ল সৌরভে পাশ্চাত্য নরনারী ছুটিয়া আসিয়াছে—ভারতের জয়ডঙ্কা বাজিয়াছে। কিন্তু জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে, উৎসবের ময়দানে, ভারত তেমন করিয়া আসিল কৈ? সে কি তাহার জোঁয়াল ঘাড়ে করিয়াই

চিরদিন চলিবে? ঘরের কাজ নিজের হাতে করিবার অধিকার সে কি পাইবে না? বিশ্বের দেয়ালি উৎসবে সে কি আপন হাতে আপন প্রদীপটি জ্বালিতে পাইবে না? সাড়ে সাত শত বৎসর আঁধারে থাকিয়া আজ যে দিনের উজ্জ্বল আলো তাহার চোখে ঝাপ্‌সা লাগাইয়া দিতেছে—সে ঝাপ্‌সা কি কাটিয়া যাইবে না—আবার কি ভারত চক্ষুষ্মান্ হইয়া নিজের ঠিক স্থানটি বিশ্বের দরবারে খুঁজিয়া লইবে না? সে শুভদিনের প্রতীক্ষায় আর কত দিন বসিয়া থাকিতে হইবে?